**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়**
**পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা**

# জেলা তথ্য ঃ বরগুনা

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

**জেলা তথ্য :**
**বরগুনা**

**প্রকাশকাল :**
জানুয়ারি ২০০৫

**প্রকাশনায় :**
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

**তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস**
**জেলা তথ্য : বরগুনা**

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ, ড. মোঃ লিয়াকত আলী ও মুহাম্মদ শওকত ওসমান। অক্ষর বিন্যাস ও লে-আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া বরগুনা জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

# মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় আছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই, জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে বরগুনা জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি সম্পদ, বনজ ও ফলজ সম্পদ ও মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে ‘সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা’ এবং ’সম্ভাবনা ও সুযোগ’-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও ‘উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ’ আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে বরগুনার উপর লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -


১। আহমেদ, সিরাজউদ্দীন, ১৯৮২। বরিশাল বিভাগের ইতিহাস। ভাস্কর প্রকাশনী, বরিশাল- ঢাকা। ঢাকা, জুলাই, ২০০৩।

২। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ২০০২। সংকলন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, বরগুনা জেলা শাখা। বরগুনা, নভেম্বর ২০০২।

৩। বি.বি.এস., ২০০১। কৃষি শুমারি ১৯৯৬ : জেলা সিরিজ বরগুনা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০১।

৪। ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

৫। PDO-ICZMP, 2001.Inventory of Coastal & Estuarine Island & Char lands (Draft Report), Program Development Office for Intergrated Coastal Zone Management Plan Project; Bangladesh, Dhaka, August 2001.

৬। CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh. Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services, Dhaka, May 2004.

৭। M.A. LATIF, MAJOR GENERAL (Retired), 1982. Bangladesh District Gajetteers Patuakhali, Establishment, Division, Government of the People’s Republic of Bangladesh. Dhaka, December 1982.


তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বরগুনা জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।


এ ছাড়াও বইটির বিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- জনাব মো: বজলুর রহমান, সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, বরগুনা।
- জনাব মির্জা এস আই খালেদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সংকল্প ট্রাষ্ট, পাথরঘাটা, বরগুনা।

# সূচীপত্র


**মুখবন্ধ**
**জেলা মানচিত্র**

| | |
|---|---|
| **সূচনা** | **১-৪** |
| এক নজরে বরগুনা | ২ |
| জেলার অবস্থান | ৩ |
| উপজেলা তথ্য সারণী | ৪ |
| **প্রকৃতি ও পরিবেশ** | **৫-১১** |
| প্রাকৃতিক পরিবেশ | ৫ |
| কৃষি সম্পদ | ৮ |
| মৎস্য সম্পদ | ৮ |
| দুর্যোগ | ৯ |
| বিপদাপন্নতা | ১১ |
| **জীবন ও জীবিকা** | **১৩-১৬** |
| জনসংখ্যা | ১৩ |
| জনস্বাস্থ্য | ১৩ |
| শিক্ষা | ১৪ |
| সামাজিক উন্নয়ন | ১৪ |
| প্রধান জীবিকা দল | ১৪ |
| অর্থনৈতিক অবস্থা | ১৫ |
| দারিদ্র | ১৬ |
| **নারীদের অবস্থান** | **১৭-১৮** |
| **অবকাঠামো** | **১৯-২১** |
| রাস্তা-ঘাট | ১৯ |
| নৌ-পথ | ১৯ |
| পোল্ডার/বাঁধ | ১৯ |
| ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ | ১৯ |
| হাট-বাজার ও বন্দর | ১৯ |
| বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ | ২০ |
| সেচ ও গুদাম | ২০ |
| শিল্পাঞ্চল | ২০ |
| উন্নয়ন প্রকল্প | ২০ |
| হোটেল/অবকাশযাপন কেন্দ্র | ২১ |
| **সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা** | **২৩-২৫** |
| পরিবেশগত সমস্যা | ২৩ |
| আর্থ-সামাজিক সমস্যা | ২৪ |
| পর্যটন বিষয়ক সমস্যা | ২৫ |
| **সম্ভাবনা ও সুযোগ** | **২৭-২৯** |
| কৃষি ও অর্থনীতি | ২৭ |
| মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ২৭ |
| পর্যটন শিল্প | ২৮ |
| প্রাকৃতিক সম্পদ | ২৯ |
| শিল্প ও বাণিজ্য | ২৯ |
| **ভবিষ্যতের রূপরেখা** | **৩১** |
| **দর্শনীয় স্থান** | **৩৩** |

# জেলা মানচিত্র

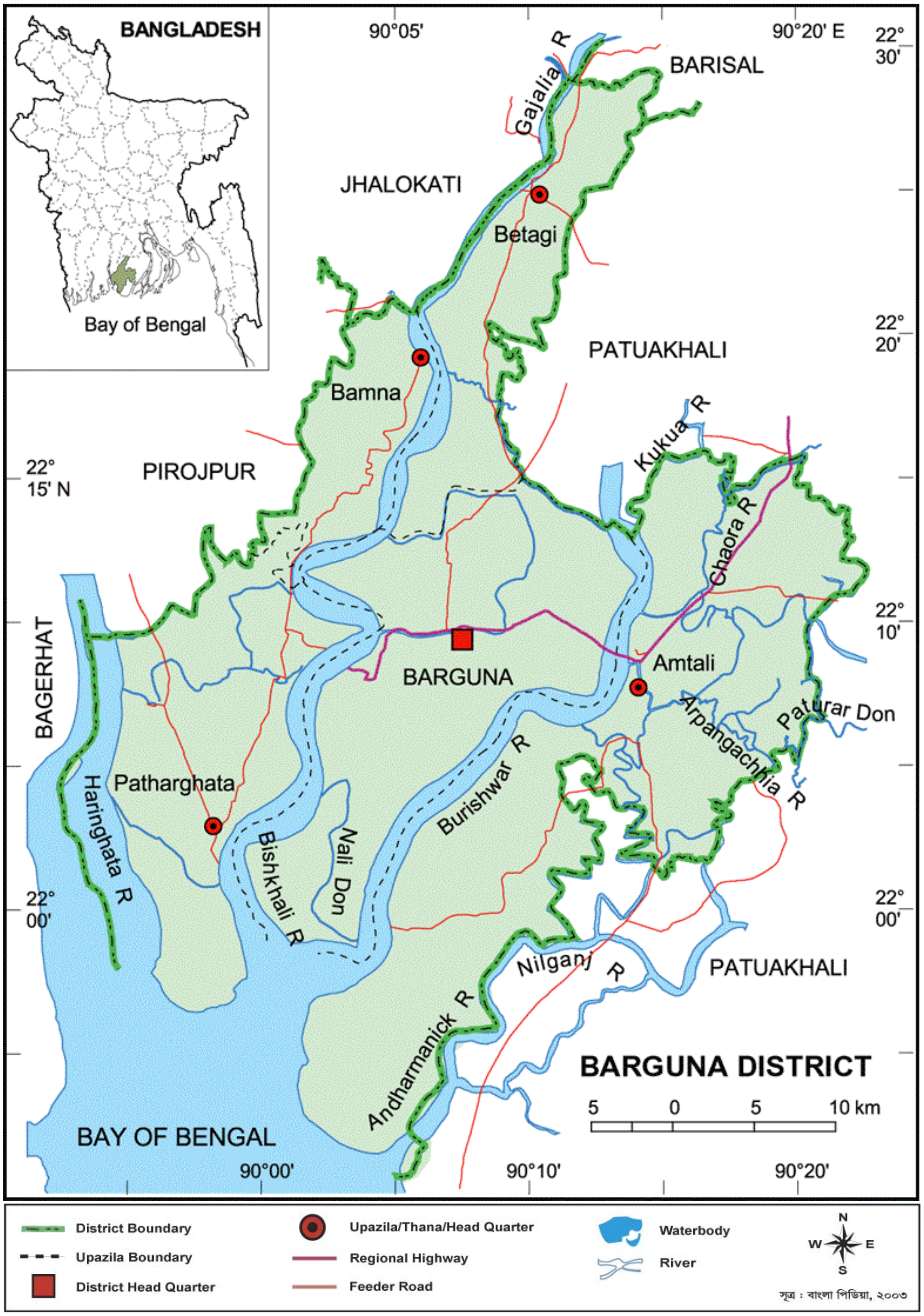

BANGLADESH
Bay of Bengal
90°05'
90°20' E
22° 30'
BARISAL
Gajalia R
JHALOKATI
Betagi
22° 20'
PATUAKHALI
Bamna
PIROJPUR
22° 15' N
Kukua R
Chaora R
22° 10'
BARGUNA
Amtali
Patuarar Don
Arpangachhia R
BAGERHAT
Patharghata
Haringhata R
Bishkhali R
Naii Don
Burishwar R
22° 00'
Nilganj R
PATUAKHALI
Andharmanick R
BARGUNA DISTRICT
5 0 5 10 km
BAY OF BENGAL
90°00'
90°10'
90°20'
District Boundary
Upazila Boundary
District Head Quarter
Upazila/Thana/Head Quarter
Regional Highway
Feeder Road
Waterbody
River
N
W
E
S
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

# সূচনা

ফসলের মাঠ, গাছ-গাছালি, নদী-নালা আর সমুদ্র সৈকত নিয়ে এক অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত জেলা বরগুনা। প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যে বরগুনা জেলা নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পদ্মা এবং মেঘনার পলল ভূমি দ্বারা গঠিত বরগুনা জেলার একদিকে লবণ পানি অন্যদিকে মিঠা পানিপ্রবাহ। এর পূর্বে পটুয়াখালী ও পশ্চিমে পিরোজপুর, বাগেরহাট এবং উত্তরে ঝালকাঠী জেলা ও দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ বঙ্গোপসাগর।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিষখালী নদীর তীরে ফুলঝুড়িতে একটা অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯০৪ সালে আমতলী থানা থেকে আলাদা করে বরগুনাকে আলাদা একটি স্থায়ী থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬৯ সালে বরগুনা 'মহকুমা'-য় রূপান্তরিত হয় এবং বেতাগী, বামনা, পাথরঘাটা, আমতলী ও বরগুনা সদর থানা এই মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি বরগুনা মহকুমা জেলায় রূপান্তরিত হয়।

বরগুনা নামের ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও জানা যায় যে উত্তরাঞ্চলের কাঠ ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা এই অঞ্চলে এসে খরস্রোতা খাকদোন নদী অতিক্রমের সময় অনুকূল প্রবাহ বা বড় গোনের জন্য এখানে অপেক্ষা করতো। ফলে এ স্থানের নাম হয়ে যায় 'বড় গোনা'। কারো মতে আবার স্রোতের বিপরীতে গুন (দড়ি) টেনে নৌকা অতিক্রম করতে হতো বলে এ স্থানের নাম হয় বরগুনা। আবার কেউ কেউ বলেন, বরগুনা নামের কোন প্রতাবশালী রাখাইন মগ অধিবাসীর নামানুসারে বরগুনা নামকরণ করা হয়। আবার কারো মতে বরগুনা নামের কোন এক বাওয়ালীর নামানুসারে এ স্থানের নামকরণ করা হয় বরগুনা।

বরগুনা জেলার মোট আয়তন ১৮৩১.৩১ বর্গ কিলোমিটার। যা সমগ্র বাংলাদেশের আয়তনের ১.২৭%। এলাকার বিচারে এটি উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার মধ্যে আয়তনে ১১তম স্থানে ও বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩৭তম স্থানে এবং বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার মধ্যে ৪র্থ স্থানে রয়েছে।

৫টি উপজেলা, ৪টি পৌরসভা, ৩৮টি ইউনিয়ন, ৩১১টি মৌজা/মহল্লা, ৫৬৩টি গ্রাম নিয়ে বরগুনা জেলা। বরগুনা সদর, আমতলী, বামনা, বেতাগী, পাথরঘাটা জেলার ৫টি উপজেলা।

| | |
|---|---|
| উপজেলা | ৫টি |
| পৌরসভা | ৪টি |
| ইউনিয়ন | ৩৮টি |
| ওয়ার্ড | ৩৬টি |
| মৌজা /মহল্লা | ৩১১টি |
| গ্রাম | ৫৬৩টি |

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জোয়ার-ভাটার প্রভাব, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে বরগুনা জেলার আমতলী, বরগুনা সদর ও পাথরঘাটা তীরবর্তী (Exposed Coast) এবং বামনা ও বেতাগী উপজেলা অন্তর্বর্তী উপকূলীয় (Interior Coast) এলাকায় পড়েছে।

# এক নজরে বরগুনা

| বিষয় | | একক | বরগুনা | উপকূলীয় অঞ্চল | বাংলাদেশ | তথ্য সূত্র ও বছর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| এলাকা/ প্রশাসনিক | এলাকা | বর্গ কি.মি. | ১,৮৩১ | ৪৭,২০১ | ১৪৭,৫৭০ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | উপজেলা | সংখ্যা | ৫ | ১৪৭ | ৫০৭ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | ইউনিয়ন | সংখ্যা | ৩৮ | ১৩৫১ | ৪৪৮৪ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | পৌরসভা | সংখ্যা | ৪ | ৭০ | ২২৩ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | ওয়ার্ড | সংখ্যা | ৩৬ | ৭৪৩ | ২৪০৪ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | মৌজা / মহল্লা | সংখ্যা | ৩১১ | ১৪৬৩৬ | ৬৭০৯৫ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | গ্রাম | সংখ্যা | ৫৬৩ | ১৭৬১৮ | ৮৭৯২৮ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| জনসংখ্যা | মোট জনসংখ্যা | লাখ | ৮.৪৫ | ৩৫০.৭৮ | ১,২৩৮.৫১ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | পুরুষ | লাখ | ৪.৩৫ | ১৭৯.৪২ | ৬৩৮.৯৫ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | নারী | লাখ | ৪.০৯ | ১৭১.৩৫ | ৫৯৯.৫৬ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | জনসংখ্যার ঘনত্ব | বর্গ কি.মি. | ৪৬২ | ৭৪৩ | ৮৩৯ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | লিঙ্গ অনুপাত | অনুপাত | ১০৬ | ১০৪.৭ | ১০৬.৬ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | গৃহস্থালির আকার | গৃহ প্রতি জনসংখ্যা | ৪.৭ | ৫.১ | ৪.৯ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | গৃহস্থালির মোট সংখ্যা | লাখ | ১.৮ | ৬৮.৪৯ | ২৫৩.০৭ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | নারী প্রধান গৃহ | গ্রামীণ গৃহস্থের (%) | ১.৩ | ৩.৪৪ | ৩.৫ | ১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯) |
| ভৌত অবকাঠামো | টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর | মোট গৃহস্থের (%) | ৩৯ | ৪৭ | ৪২ | ১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪) |
| | টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর | মোট গৃহস্থের (%) | ৩১ | ৫০ | ৫৪ | ১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪) |
| | বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর | মোট গৃহস্থের (%) | ২৬ | ৩১ | ৩১ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | প্রাথমিক স্কুল | সংখ্যা / ১০,০০০ জন | ১১.৭ | ৭ | ৬ | ২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩) |
| | রাস্তার ঘনত্ব | কি.মি./বর্গ কি.মি. | ০.৭০ | ০.৭৬ | ০.৭২ | বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩ |
| | বাজারের ঘনত্ব | বর্গ কি.মি. / সংখ্যা | ৮০ | ৮০ | ৭০ | ১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬) |
| অর্থনীতি | মোট আয় | কোটি টাকা | ১,৫৮৫ | ৬৭,৮৮০ | ২,৩৭,০৭৪ | ১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২) |
| | মাথাপিছু আয় | টাকা | ১৬,৯০১ | ১৮,১৯৮ | ১৮,২৬৯ | ১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২) |
| | কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর+) | হাজার | ৬০৪ | ১৭,৪১৮ | ৫৩,৫১৪ | ১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২) |
| | কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে) | % (১৫-৪৯ বয়সদল) | ২৭ | ২৬ | ২৮ | ২০০১ (নিপোর্ট, ২০০৩) |
| | কৃষি শ্রমিক | গ্রামীণ গৃহস্থের (%) | ৩২ | ৩৩ | ৩৬ | ১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯) |
| | জেলে | গ্রামীণ গৃহস্থের (%) | ৩৮ | ১৪ | ৮ | ১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯) |
| | মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ | হেক্টর | ০.১১ | ০.০৬ | ০.০৭ | ১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯) |
| | দারিদ্র | মোট গৃহস্থের (%) | ৫২ | ৫২ | ৪৯ | ১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২) |
| | অতি দারিদ্র | মোট গৃহস্থের (%) | ২২ | ২৪ | ২৩ | ১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২) |
| শিক্ষা | প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার | ৬-১০ বছর শিশু(%) | ১০৭ | ৯৫ | ৯৭ | ২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩) |
| | সাক্ষরতার হার (৭ বছর+) | মোট জনসংখ্যা (%) | ৫৪ | ৫১ | ৪৫ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | পুরুষ | % | ৫৬ | ৫৪ | ৫০ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | নারী | % | ৫১ | ৪৭ | ৪১ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | সাক্ষরতার হার (১৫ বছর+) | মোট জনসংখ্যা (%) | ৫৬ | ৫৭ | ৪৭ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | পুরুষ | % | ৬০ | ৬১ | ৫৪ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | নারী | % | ৫২ | ৪৯ | ৪১ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| স্বাস্থ্য | গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল) | প্রতি গড় জনসংখ্যা | ৭৪ | ১১১ | ১১৫ | ২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩) |
| | কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর | মোট গৃহস্থের (%) | ৭২ | ৮৮ | ৯১ | ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩) |
| | স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর | মোট গৃহস্থের (%) | ৩৭ | ৪৬ | ৩৭ | ২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩) |
| | হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি) | জন/শয্যা | ৩,২৪৩ | ৪,৬৩৭ | ৪,২৭৬ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | নবজাতক মৃত্যুর হার | প্রতি হাজারে | ৫৫ | ৫১-৬৮ | ৪৩ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | <৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার | প্রতি হাজারে | ৯৪ | ৮০-১০৩ | ৯০ | ২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১) |
| | অতি অপুষ্টির হার | % | ৪ | ৬ | ৫ | ২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১) |
| | ছেলে | % | ২ | ৪ | ৪ | ২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১) |
| | মেয়ে | % | ৫ | ৮ | ৬ | ২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১) |
| | মাতৃ মৃত্যুর হার | প্রতি হাজারে | ৩.১১ | ৫ | ৫ | ১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর, ২০০০) |
| | আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী | % | ৪৯.৬ | ৪১ | ৪৪ | ২০০১ (নিপোর্ট, ২০০৩) |

# জেলার অবস্থান

## জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার (৫.৬%), জাতীয় (৫.৪%) ও উপকূলীয় (৫.৪%) হারের চেয়ে বেশি।
- সাক্ষরতার হার (৭$^+$) ৫৪%, যা জাতীয় (৪৫%) ও উপকূলীয় (৫১%) হারের তুলনায় বেশি।
- জেলায় ভূমিহীনের সংখ্যা (৪৯%), জাতীয় (৫৩%) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৪%) তুলনায় কম।
- জেলায় ৩৭% ঘড় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাসম্পন্ন, যা জাতীয় (৩৭%) হারের সমান কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় (৪৬%) কম।
- হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ৩,২৪৩ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৬ জন) ও উপকূলীয় (৪,৬৩৭ জন) অঞ্চলের তুলনায় ইতিবাচক।
- জেলার মোট আয়তনের ০.১১ ভাগ প্রত্যন্ত এলাকা।
- নিম্ন মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা।

## জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- বরগুনা জেলার মাথাপিছু আয় (১৬,৯০১ টাকা) জাতীয় আয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় কম।
- জেলায় দারিদ্র্যপীড়িত ও অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (৫২%, ২২%) জাতীয় (৪৯%, ২৩%) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের (৫২%, ২৪%) তুলনায় বেশি।
- জেলায় গড়ে প্রতি ৮০ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র রয়েছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) অবস্থার তুলনায় অপর্যাপ্ত কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) সাথে সংগতিপূর্ন ।
- জেলার মোট গৃহের ৭২% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় (৯১%) ও উপকূলীয় হারের (৮৮%) তুলনায় কম।
- ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা ৫৭%, যা জাতীয় হারের (৫৩%) তুলনায় বেশি।
- মাথাপিছু শিল্প আয়ের ভাগ (১২%), জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় (২২%) হারের তুলনায় কম।
- জেলার মোট বিদ্যুৎ সংযোগের পরিমাণ (২৬%), জাতীয় (৩১%) এবং উপকূলীয় (৩১%) হারের তুলনায় কম।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার (৫৫), জাতীয় (৪৩) হারের তুলনায় বেশি এবং উপকূলীয় অঞ্চলের (৫০.৬-৬৮) বিবেচনায় সমান।
- জেলায় শহুরে জনসংখ্যা (১১%), জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।

# উপজেলা তথ্য সারণী

| | বিষয় | একক | বরগুনা | উপজেলা | | | | | তথ্য সূত্র ও বছর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | সদর | আমতলী | বামনা | বেতাগী | পাথরঘাটা | |
| এলাকা/ প্রশাসনিক | এলাকা | বর্গ কি.মি. | ১৮৩১ | ৪৫৪ | ৭২১ | ১০১ | ১৬৮ | ৩৮৭ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | ইউনিয়ন / ওয়ার্ড | সংখ্যা | ৭৪ | ১৯ | ১৯ | ৪ | ১৬ | ১৬ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | মৌজা / মহল্লা | সংখ্যা | ৩১১ | ৬৯ | ৮৩ | ৩৯ | ৬৮ | ৫২ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | গ্রাম | সংখ্যা | ৫৬৩ | ১৯২ | ১৮১ | ৪৯ | ৭৫ | ৬৬ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| জনসংখ্যা | মোট জনসংখ্যা | লাখ | ৮.৪৫ | ২.৪০ | ২.৬০ | .৬৮ | ১.১৩ | ১.৬২ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | পুরুষ | লাখ | ৪.৩৫ | ১.২২ | ১.৩৩ | .৩৪ | .৫৯ | .৮৫ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | নারী | লাখ | ৪.০৯ | ১.১৭ | ১.২৭ | .৩৪ | .৫৩ | .৭৬ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | জনসংখ্যার ঘনত্ব | জন/বর্গ কি.মি. | ৪৬২ | ৫২৮ | ৩৬২ | ৬৭৮ | ৬৭৬ | ৪১৯ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | লিঙ্গ অনুপাত | অনুপাত | ১০৬ | ১০৪ | ১০৫ | ৯৯ | ১১০ | ১১২ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | গৃহস্থালির মোট সংখ্যা | লাখ | ১.৮০ | .৫০ | .৫৪ | .১৫ | .২৫ | .৩৪ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | গৃহস্থালির আকার | জন/গৃহস্থালি | ৪.৭ | ৪.৭৩ | ৪.৮০ | ৪.৫০ | ৪.৫১ | ৪.৭০ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | নারী প্রধান গৃহ | মোট গ্রামীণ গৃহস্থের % | ১.৩ | ২.০ | ১.৮ | ২.৬ | ১.৯ | ২.০ | ১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯) |
| ভৌত অবকাঠামো | টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর | মোট গৃহস্থের (%) | ৩৯ | ৩৩ | ২৪ | ৫৯ | ৬০ | ৪৭ | ১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪) |
| | টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর | মোট গৃহস্থের (%) | ৩১ | ২৮ | ২২ | ৪৪ | ৫৯ | ২২ | ১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪) |
| | বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর | মোট গৃহস্থের (%) | ৩ | ৪.৭৩ | ১.৯৯ | ১.১৪ | ২.২২ | ১.৪৯ | ১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪) |
| | প্রাথমিক বিদ্যালয় | মোট সংখ্যা | ৯৮১ | ২৪৯ | ৩২০ | ১০২ | ১৪১ | ১৬৯ | ২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩) |
| | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | মোট সংখ্যা | ৩৯০ | ৫০ | ৫০ | ১০ | ২৪ | ২৪ | ২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩) |
| | মহাবিদ্যালয় | মোট সংখ্যা | ১৯ | ৪ | ৭ | ২ | ৪ | ২ | ২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩) |
| অর্থনীতি | কৃষি শ্রমিক | মোট গ্রামীণ গৃহস্থের % | ৩২ | ২৬ | ৩৯ | ২৭ | ২০ | ৩৬ | ১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯) |
| | কৃষি প্রধান পরিবার | মোট গ্রামীণ গৃহস্থের % | ৭৯ | ৭৪ | ৭৫ | ৭৯ | ৮৬ | ৮৪ | ১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯) |
| | অকৃষি প্রধান পরিবার | মোট গ্রামীণ গৃহস্থের % | ২১ | ২৬ | ২৫ | ২১ | ১৪ | ১৬ | ১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯) |
| | মোট চাষের জমি | হেক্টর | ৮৪,৪৮৫ | ২০,৭২৫ | ৩২,০৪৭ | ৫,৯৪০ | ১০,৫০০ | ১৫,২৭৩ | ১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯) |
| | এক ফসলী | মোট কৃষি জমির (%) | ৫৬ | ২৭ | ৬৩ | ১৫ | ৩৫ | ৬০ | ২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩) |
| | দো ফসলী | মোট কৃষি জমির (%) | ৩৭ | ৪২ | ২৫ | ৭৪ | ৫০ | ৩ | ২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩) |
| | তিন ফসলী | মোট কৃষি জমির (%) | ৭ | ৩১ | ১২ | ১২ | ১৫ | ১০ | ২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩) |
| | প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য | টাকা | ৬,০০০ | ৫,০০০ | ৬,০০০ | ৬,০০০ | ৯,০০০ | ৫,০০০ | ২০০৩ (বাংলাপিডিয়া, ২০০৩) |
| শিক্ষা | সাক্ষরতার হার (৭ বছর+) | % | ৫৪ | ৫৩ | ৪৪ | ৬৬ | ৫৯ | ৬০ | ২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩) |
| | প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার | ৬-১০ বছর শিশু (%) | ১০৭ | ১০০ | ১০০ | ৯৭ | ১৮৮ | ১০০ | ২০০১(প্রা.শি.অ) |
| | মেয়ে | ৬-১০ বছর শিশু (%) | ১০৯ | ১০২ | ১০২ | ১০৫ | ১৯৩ | ১০১ | ২০০১(প্রা.শি.অ) |
| স্বাস্থ্য | সক্রিয় টিউবওয়েল | সংখ্যা | ১১,৪৯২ | ২,৪২০ | ২,৪১০ | ৯১৬ | ১,৬০৬ | ৪,১৪০ | ২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩) |
| | কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর | মোট গৃহস্থের (%) | ৭৩ | ৮৬ | ৭৯ | ৭৮ | ৮১ | ৩৫ | ১৯৯১(বি.বি.এস, ১৯৯৪) |
| | স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর | মোট গৃহস্থের (%) | ৭.৯৭ | ১০.০৯ | ৩.৬৫ | ৯.৮৬ | ১১.২২ | ৮.৪৯ | ১৯৯১(বি.বি.এস, ১৯৯৪) |

# প্রকৃতি ও পরিবেশ

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, নদী-নালা, খাল, সমুদ্র সৈকত, মোহনা, চর দ্বীপ, ঝড়, বন্যা, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস নিয়ে বরগুনা জেলার একটি নিজস্ব বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে। জেলায় প্রাকৃতিক কারণেই সবুজের সমারোহ। এই জেলার সর্বত্রই বনজ ও ফলজ গাছ-গাছালি আর ফসলের মাঠ। জেলার সর্বত্র দেখে মনে হয় যেন উপর থেকে ছেটে দেয়া কোন ঘন অরণ্য।

## প্রাকৃতিক পরিবেশ

**নদী ও খাল :** পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল-খাঁ ও মধুমতি নদীর অববাহিকায় বরগুনা জেলা। বরগুনার প্রকৃতি নদী আর সাগরনির্ভর। এই জেলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে বেশ কয়েকটি বড় নদী। আর জালের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু ছোট নদী-নালা ও খাল। জেলার প্রধান নদীগুলো হচ্ছে পায়রা, বিশখালী, বলেশ্বর ও হরিণঘাটা। টিয়াখালী নদী, টিয়াখালী দোন, বগীরখাল, বেহুলা নদী, আমতলী নদী, নিদ্রাখাল, চাকামাইয়া দোন ইত্যাদি প্রধান কয়েকটি ছোট নদী ও খাল । আরও নাম না জানা বহু খাল আছে। বরগুনা জেলার সব নদীই নাব্য এবং সারা বছর ধরে নৌযান চলাচলের উপযোগী। এই জেলায় মোট ১৬০ বর্গ কি.মি. নদী রয়েছে। জেলার মোট আয়তনের প্রায় ২২% -ই নদী।

**মোহনা :** অপরূপ প্রাকৃতিক ও (প্রাণের) বৈচিত্র্যে ভরা এই জেলার মোহনা মানুষকে কাছে টানে। এই মোহনায় রয়েছে বেশ কিছু চর। চর ও মোহনার মানুষেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে যেমন মিতালী করে বসবাস করছে, তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে যুদ্ধ করে টিকে আছে। জেলায় দুটি নদীর মোহনা রয়েছে। বিষখালী ও বলেশ্বর নদী হরিণঘাটায় মিলিত হয়ে সাগরে পতিত হয়েছে। পায়রা নদী বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হয়ে আর একটি মোহনার সৃষ্টি হয়েছে।

**চর-দ্বীপ সৈকত :** বিষখালী, বলেশ্বর ও পায়রা নদীর মোহনার সোনাকাটার চর, ফাতরার চর, লালদিয়া ও নিশানবাড়ীয়া চর বরগুনার প্রধান কয়েকটি চর। যার আয়তন সমগ্র জেলার মোট আয়তনের ০.১১% ।

কিছু চরে স্থায়ী জনবসতি গড়ে উঠেছে। কিছু কিছু চরে অস্থায়ী বসতি গড়া হয়। কেননা বর্ষা মৌসুমের সময় সমুদ্রের জোয়ারের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার ফলে বসবাস করা সম্ভব হয় না। ভরা জোয়ার বা অমাবস্যা-পূর্ণিমার জোয়ারের পানি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থাও নেই। এ সব চরের ফসল প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। আবার কিছু কিছু চরে ফসল, সম্পদ ও জনবসতি এলাকা রক্ষার জন্য সুরক্ষিত বাঁধ রয়েছে। এ সব চরে জনবসতি বেশি এবং ফসলেরও চাষ হয়ে থাকে। উল্লেখ্য জেলায় নদীর তীরের মূল ভূমির সংলগ্ন বহু চর রয়েছে।

বরগুনা জেলার দক্ষিণে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তীর্ণ বঙ্গোপসাগর। এই সাগর তীরে জেলার মূল ভূমি সংলগ্ন বড় সৈকত রয়েছে।

**জলবায়ু :** বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত এই জেলা ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এই জেলায় ষড়ঋতুর মধ্যে তিনটি মৌসুম জোরালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্ম মৌসুম সাধারণত মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত। এই

সময়কে অনেকটা প্রাক-বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ ঝড় বা দমকা বাতাস বইতে থাকে, যাকে কালবৈশাখী বলা হয়। তবে এই জেলায় কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টির প্রকোপ কম। জুন হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত 'বর্ষা' মৌসুম স্থায়ী হয়। বছরের প্রায় ৯০% বর্ষণ এ সময় হয়। নভেম্বর থেকে শীত শুরু হয় এবং ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হয়।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের প্রকোপ প্রধানত জুন-জুলাই ও অক্টোবর-নভেম্বরে বেশি হয়। ফলে এই জেলায় সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বরগুনা জেলায় নভেম্বর-ডিসেম্বর অথবা এপ্রিল-মে মাসে জলোচ্ছ্বাস বা সাইক্লোনে রবিশস্য ও আমন ধানের প্রচুর ক্ষতি হয়।

**মাটি :** জেলার ভূ-প্রকৃতি সমতল ধরনের। আর মাটি প্রধানত পলিময় এঁটেল ধরনের। জেলার কিছু এলাকায় দো-আঁশ মাটির আধিক্য রয়েছে। এই জেলাকে প্রধানত দুটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে, যেমন, ক) গংগা কটাল পলল ভূমি এবং (খ) মেঘনা পলল ভূমি।

**ক) গংগা কটাল পলল ভূমি :** জেলার উত্তর-পশ্চিম এলাকা এ ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এলাকাটি অপেক্ষাকৃত পুরানো সমতল ডাংগা এবং প্রশস্ত বিল ভূমি দ্বারা গঠিত এবং ছোট বড় খাল দ্বারা বিভক্ত। এ এলাকা সাধারণত বৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে স্বল্প গভীরতায় প্লাবিত হয়।

**খ) মেঘনা পলল ভূমি :** জেলার দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ এ ভূ-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে দক্ষিণে চর এবং দ্বীপের ভূ-প্রকৃতি লবণাক্ত মেঘনা সমুদ্র পলল ভূমি দ্বারা গঠিত। জেলার এই এলাকায় বৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে স্বল্প গভীরভাবে প্লাবিত হয় এবং কিছু এলাকা মাঝারি গভীরভাবে প্লাবিত হয়।

**বনজ সম্পদ :** বরগুনা জেলা এক সময় সুন্দরবনের অংশ ছিল। বর্তমানে জেলায় বনভূমির পরিমাণ ১২,৪৫১ হেক্টর। এছাড়াও ৬৯৮৭ হে. প্রাকৃতিক সংরক্ষিত বনভূমি রয়েছে, যেখানে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-গাছালি দেখা যায়। জেলার বেশ কিছু চরেও সুন্দরবনের বিভিন্ন রকমের গাছ জন্মায়। যেমন, সোনাকাটার চর।

এ ছাড়াও এই জেলায় বন বিভাগের ৬৫৪৯ হে: বন রয়েছে। যেখানে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-গাছালি লাগানো হয়েছে। যেমন, সুন্দরী, ছইলা, গোলপাতা ও কেওড়া ইত্যাদি। জেলার সর্বত্র বসত ভিটার উপর এবং বাগান ভিটায় প্রচুর গাছ রয়েছে। যেগুলো মানুষ তাদের প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি রেখেই লাগিয়েছে।

**চর ও বনায়ন :** জেলার বেশ কিছু চরে বনায়ন করা হয়েছে। এ ধরনের বনায়নের মধ্যে রয়েছে মোহনায় জেগে ওঠা চর এবং মূল ভূমির সাথে জেগে ওঠা চরাঞ্চল। এই চরাঞ্চলে যে সকল গাছ-গাছালি রোপন করা হচ্ছে সেগুলো হলো- কেওড়া, গড়ান, বাবলা, ছইলা, গোলপাতা ইত্যাদি। এ ছাড়া বাঁধের বাইরের সবুজ বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় কেওরা, গেওয়া, গোলপাতা, বাবলা ও দেশীয় বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগানো শুরু হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস থেকে সম্পদ রক্ষায় এইসব গাছের গুরুত্ব অপরিসীম।

**সমুদ্র উপকূলীয় বন :** জলোচ্ছ্বাস এবং সাইক্লোন থেকে রেহাই পাবার জন্য ৬০ দশকে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ এর কাজ শুরু হয়। এই বাঁধের বাইরের ভূমিতে বনায়ন করার জন্য ১৯৬৬ সালে তৎকালীন সরকারের বন বিভাগ একটি উদ্যোগ নেয়। এই প্রকল্পের আওতায় বরগুনা জেলায়ও বনায়ন করা হয়। এর পরে বন বিভাগ

১৯৭৬ সালে উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন প্রকল্প হাতে নেয়। এই প্রকল্পের আওতায় বেশকিছু দ্বীপ চর, মূলভূমি সংলগ্ন চর এবং উপকূলীয় বাঁধ বনায়ন করে। এর আওতায় বর্তমানে ১২,৪৫১ হেক্টর ভূমি রয়েছে। জেলার অন্যান্য সরকারী সংস্থার পক্ষ থেকেও বাঁধ ও রাস্তায় বনায়ন করা হয়েছে। জেলায় ৬০ হে. জমিতে বন বিভাগ কর্তৃক ফোরসোর বাগান করা হয়েছে।

**উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্য :** বরগুনা জেলার উত্তর অংশ লবণবিহীন পলি এবং দক্ষিণ অংশ লবণযুক্ত পলি দ্বারা গঠিত। তাই স্বাভাবিক কারণে উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের মধ্যে উভয়েরই প্রভাব আছে। বরগুনা জেলার ইতিহাস, বর্তমান ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এই জেলা একসময় সুন্দবনের অংশ ছিল। মানুষের প্রয়োজনে এই বন কেটে তৈরি করা হয়েছে ফসলের মাঠ।

বরগুনা জেলার সর্বত্র বিভিন্ন রকমের দেশীয় সবুজ গাছ-গাছালি দিয়ে ঘেরা। এই জেলায় প্রচুর প্রচুর বনজ ও ফলজ গাছ রয়েছে। প্রধান গাছ বলতে যেমন আম, কাঁঠাল, বেল, নারিকেল, আতাফল, শরিফা, কামরাঙ্গা, পাতরাজ, সুপারি, নিম, কড়ই, টল্লাবন, অরিআম, শিমুল, বিলাতিগাব, পলাশ, পেঁপে, সোনালু, জাম্বুড়া, মান্দার, বট, অশ্বথ, ডুমুর, জারুল, দেশী গাব, সাজনা, খেজুর, দেবদারু, পেয়ারা, রেইনট্রি, জাত কড়াই ইত্যাদি প্রধান। এ ছাড়াও রয়েছে চালতা, পাইনাল, কাউ, করমচা, ছৈইলা, আমরা, জলপাই, পলাশ ও কেওরাকান্ত ইত্যাদি গাছ। গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িতেই ঝোপঝাড়, বাঁশঝাড়, কলা বাগান, নারিকেল-সুপারি গাছ রয়েছে। এ ছাড়াও এই জেলায় আরো বিশেষ কিছু গাছ দেখা যায়, যেমন, চালতা, পাইনাল, কাউ, করমচা, ছৈইলা, আমড়া, জলপাই, পলাশ ও কেওড়াকান্ত ইত্যাদি। স্থানীয় তৃণ লতা-পাতার মধ্যে দেখা যায় হারগোজা, নোলা ঝাউ, টামবুল কাটা, ছোদাবন, সুন্দরী লতা, শিংগারা, কালশি ইত্যাদি।

জেলার বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন জাতের কুমির, হাঙ্গর, খরগোস, ডোরাবাঘ, বন্য শূকর, চিত্রা হরিণ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। বানর, মেছো বিড়াল, বাগদাস, খাটাস, গন্ধগোকুল, ছোট বেজী, সাধারণ বড় বেজী, পাতিশিয়াল, উদ বিড়াল, কলাবাদুড়, মধ্যম আকারের বাদুড়, ভুয়া রক্তচোষা বাদুড়, চামচিকা, ব্রাশজেলা সজারু, চূড়াহীন হিমালয়ী সজারু, বাটা, কালো ইঁদুর, বাইট্যা বা নেংটি ইঁদুর, ব্যান্ডিকোটা ইঁদুর, ছোট ব্যান্ডিকোটা ইঁদুর, চিকা, পদ্মা শুশুক বা হু ইত্যাদি জেলার প্রধান কয়টি প্রাণী।

এ ছাড়াও সরিসৃপের মধ্যে রয়েছে সুন্দি কাছিম, কাউটা কাছিম, মগম কাছিম ও দুরা, টিকটিকি, রক্তচোষা, তক্ষক বা তক্ষণাথ, আর্জিনা, গুঁইসাপ, দেয়াল টিকটিকি, অজগর, একচক্র জাতিসাপ, দ্বিচক্র জাতিসাপ, শঙ্খিনী, দুমুখো সাপ, কেউটে, ঢোঁড়া সাপ, মাইটে সাপ, দাড়াস বা ধামন সাপ, লাউডগা, ৫/৬ প্রজাতির সামুদ্রিক সাপ, মোহনার লাটি সাপ, চন্দ্র বোড়া, সরু কানা সাপ, বামন কানা সাপ ইত্যাদি।

এই জেলায় বহু পাখ-পাখালি দেখা যায়। প্রধান ডুবুরি, ছোট পাখিদের মধ্যে পানকৌড়ি বা ছোট পানিকামড়ি, গয়ার বা সাপ পাকি, কর্চি বক বা গুজা বক, মহিষে বক বা গো বক, ডাড় বক বা ধলি বক, মাঝারি বক, ছোট বক, নিশাবক বা অক, রঙ্গিলা বা সোন ডঙ্গা, ঘোঙটা বা বাচি চোরা, বুনো রাজহাঁস, ছোট সরাল বা মরাল, বড় সরাল বা মরাল, বামন হাঁস, বালিহাঁস, চখাচখি, ভবন চিল, শঙ্কচিল বা লাল চিল, কোরা ঈগল, ডাহুক, কোরা, কালো কুট, জলপিপি, লাল হোট টিটি, হলুদ হোটাটিটি, জল চা পাখি, সুচ লেজা চ্যাগা, বাটান, রঙিগলা চ্যাগা, পদ্মা জল কবুতর, কালো মাথা জল কবুতর, মাছ খেকো গাঙচিল, কালচে গাঙচিল, কপোত বা বুনো কবুতর, সবুজ কবুতর বা হরিয়াল, সবুজ ঘুঘু, লাল ঘুঘু, রাজ ঘুঘু বা ধোরাল ঘুঘু, টিলা ঘুঘু, চোখ গেলো, বউ কথা কও, পাপিয়া, কালো কোকিল, কানা কোয়া, লক্ষী পেঁচা, কাঠুরে পেঁচা, যুক্ত পেঁচা, রাত চরা পাখি, নাককাঠি, আবাবিল, পাকরা মাছরাঙা, সবুজ সুই চোর, নীল কণ্ঠ, হুদ হুদ, বসন্ত বাউরী বা কপার স্মিথ, বড় ভগীরথ, নীলগলা ভগীরথ, মেঠো কুড়ালী বা কাঠ ঠোকরা, সবুজ কুড়ালী, ক্ষুদে সোনলী কুড়ালী, বড় সোনালী কুড়ালী, পূবে আকাশি ভরত, সাধারণ সোয়ালো, বাঘাটিকি, বাদামী কসাই পাখি, কালোমাথা হলদে পাখি, হলুদিয়া পাখি বা বেনে বউ, কালো ফিঙ্গে, গুবরে শালিক,

কাঠ শালিক, ভাত শালিক, ঝুট শালিক, তাড়ুয়া বা হাঁড়ি চাচা, পাতিকাক, দাঁড়কাক, ক্ষুদে সাত সেলি, ফটিকজল, সিপাহী বুলবুল, বুলবুল, লাল বুক চোটক, সাদা ভুরু বরন বাটা, টুনটুনি, দোয়েল, সাতেরি, সাত ভাইলা, ধূসর টিট, বাদামী উড নাটাক, গেছো পিপিট, সাদা খঞ্জনা, হলুদ মাথা খঞ্জনা, ফুলচুষি, বেগুনি মৌচুষি, বেগুনি পুচ্ছ ভিত্তি মৌচুষি, ছিটা মুনিয়া, লাল মুনিয়া, বাবুই বা বয়নকারী পাখি, চড়ুই এর নাম উল্লেখযোগ্য।

## কৃষি সম্পদ

বরগুনা জেলা সম্পূর্ণভাবে কৃষি নির্ভর জেলা। প্রাকৃতিক জোয়ার-ভাটার কারণে ভূমির উর্বরতা অনেক বেশি। এই জেলার বৃহৎ অংশ ভূমিই কৃষি আবাদের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। জেলায় মোট চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৪,৪৮৫ হেক্টর।

**প্রধান ফসল :** জেলার প্রধান ফসল ধান। তাই বেশিরভাগ জমিতে রোপা আমন ধান চাষ হয়। এ ছাড়া আউশ ও বোরো ধানের চাষ করা হয়। অন্যান্য শস্যের মধ্যে ডাল, বাদাম, সরিষা, সয়াবিন, তিল, সূর্যমুখী, খেসারি, ছোলা, ফেলন, মুশুরি, মটর, মুগ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। শীতকালীন শাক-সবজির মধ্যে আলু, ওলকচু, মূলা, শালগম, মিষ্টি আলু, কুমড়া, লাউ, শিম, বরবটি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, ঝিঙ্গা, চালকুমড়া, চিচিংগা, লালশাক, ডাঁটাশাক, ঢেঁড়শ, শশা, পটল, পালংশাক, ধনিয়াশাক, পুঁইশাক, কচুলতি শাক, কচু, বেগুন ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।শীতকালীন খাদ্যশস্যের মধ্যে আলু, ওলকচু, মূলা, শালগম, মিষ্টি আলু, কুমড়া, লাউ, শিম, বরবটি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, ঝিঙ্গা, চালকুমড়া, চিচিংগা, লালশাক, ডাঁটাশাক, ঢেঁড়শ, শশা, পটল, পালংশাক, ধনিয়াশাক, পুঁইশাক, কচুলতি শাক, কচু, বেগুন ইত্যাদি শাক-সবজি এ জেলায় উৎপাদন করা হয়। লবনাক্ত হওয়া সত্বেও পাথরঘাটা উপজেলায় আলু চাষে বাম্পার ফলন হচ্ছে।

| | |
|---|---|
| **প্রধান অর্থকরী ফসল** | **নারিকেল, সুপারি, পান, কলা, আখ** |
| প্রধান ফসল | ধান, ডাল, বাদাম, সরিষা, সুপারি, গম, আলু এবং আখ |

নারিকেল, সুপারি, পান, কলা, আখ ইত্যাদি জেলার অর্থকরী ফসল। জেলার উত্তরাংশে অর্থাৎ মিঠা পানি এলাকায় প্রচুর কলা বাগান রয়েছে। এ ছাড়া বসতবাড়ির আশপাশে প্রচুর দেশীয় কলা যেমন কাঠালী কলা, দুধ কাঠালী ও সাগর কলা গাছ দেখা যায়। এছাড়া বিচি কলা দরিদ্র কৃষকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়।

**পশু সম্পদ :** জেলার পশু সম্পদের সাথে অন্যান্য উপকূলীয় এলাকার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। জেলার বেশিরভাগ গৃহস্থই হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল, মহিষ লালন-পালন করে। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারি অনুসারে জেলার গ্রামীণ এলাকায় মোট ৭৪২০০টি গৃহে গবাদিপশু রয়েছে, যা মোট গ্রামীণ গৃহস্থালির ৫১%। জেলায় গবাদিপশুর সংখ্যা মোট ২৫৬১০০টি এবং ঘর প্রতি গবাদি পশুর সংখ্যা ৩.৪৫টি।

| | |
|---|---|
| **মোট গবাদিপশু র সংখ্যা** | ২৩৭২৩৮টি |
| **ঘর প্রতি গবাদিপশু (গড়)** | ১.৬৫টি |

## মৎস্য সম্পদ

**সাগরের মাছ :** বরগুনা জেলার সমুদ্র উপকূল এবং মোহনায় প্রচুর সাগরের মাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রূপচান্দা, বাটা, ফাইসা, গুইচ্ছা, ভেটকি, পীতাম্বরী, হাউজীপাতা বা শাপলাপাতা, পাখি মাছ, বাদুড় মাছ, বিদ্যুৎ মাছ, গুর্তা, চন্দনা ও পদ্মা ইলিশ, সাগর মাগুর, উড়াল মাছ, বংশী মাছ, তুলার ডাটি, ফ্যাসার

প্রজাতি, কোড়াল মাছ, কাটা মৌছি, সাগর কাউন, লোটিয়া, চান্দা, দাতিনা, সাদা পোয়া, ছুরি মাছ, তাউল্লা বা তাউড়া, সোলি মাছ, রূপালী পটকা, বাদামী পটকা, বিষতারা, ফিতা মাচ, ডোরা রঙ্গিলা, গুটি মুর বাইল্লা, খল্লা, কাউয়া, সাগর চাপিলা ইত্যাদি। এ রকম প্রায় ১৫০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ এ উপকূলে পাওয়া যায়।

**মিঠা পানির মাছ :** জেলার নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও পুকুরে প্রচুর মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায়। মাছগুলো হচ্ছে-চাপিলা, ফ্যাসা, চিতল, ফলি, রুই, কাতলা, কালিবাউশ, নানদিনা, মৃগেল, রায়েক, কমনকার্প, ঘেসো রুই, সরপুঁটি, থাই সরপুঁটি, চোলাপুঁটি, তিতপুঁটি, ফুটনী পুঁটি, দেতো পুঁটি, কোসাপুঁটি, কাঞ্চন পুঁটি, মলা, নারকেলি চেলা, ছ্যাপচেলা, বাশঁপাতা, গুজি আইর, তল্লা আইর, বাঘা আইর, পাঙ্গাস, গোলসা টেংরা, গুলি টেংরা, বুজুরী টেংরা, কাউনে, রোল, কাজলি, বাচা, সিলেন্দা, গজার, শোল, টাকি, তেলো টাকি, কুচে, টাকা চান্দা, ভেদা, নাপতে কতই, তুন্ডবেলে, ডোরা বেলে, দুধু বেলে, কালতু বেলে, পোয়া, লাল চেউ, ডরকী চেউ, মাডস্কীপার বা ডঙ্কুর, কই, খলিসা, বইচা, খল্লা, কেচি খল্ল, তপসে, বড় বাইন, গুটি বাইন, তার বাইন, টেপা ও পটকা ইত্যাদি। এই জেলায় বেশ কিছু জলাশয় রয়েছে যেখানে প্রচুর ছোট মাছ পাওয়া যায়। যেমন, চাপিলা, পুঁটি, ট্যাংরা ইত্যাদি।

**চিংড়ি চাষ :** বরগুনা জেলায় প্রচুর চিংড়ির পোনা ধরা হয় এবং তা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হয়। ২০০১-০২ সালের হিসেব মতে এই জেলায় ৬১৮ হেক্টরে ৭০ মে. টন চিংড়ি চাষ হয়েছে। বরগুনা জেলার সমুদ্র উপকূলে প্রচুর চিংড়ি পোনা ধরা হয়। এ ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির অপ্রচলিত সম্পদ যেমন শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, শৈবাল, সী উইড, জেলী মাছ, কচ্ছপ ও প্রবাল।

**শুঁটকি :** এই জেলার মূল ভূ-খণ্ডে, চর ও দ্বীপ চরে প্রচুর শুঁটকি তৈরি করা হয়। এর মধ্যে সোনা কাটার চর, পাথরঘাটা, ছোট বগী, বড় বগী ও তালতলীতে শুঁটকি তৈরি করা হয়। প্রতি বছর জেলার বহু শ্রমিক ‘দুবলার’ চরে শুঁটকি তৈরি করার কাজে যায়। চিংড়ি, চান্দা, রূপচান্দা, ছুড়ি, লাক্ষা, লইট্যা, সামুদ্রিক ফাইস্যা ও সামুদ্রিক কোড়াল মাছ দিয়ে শুঁটকি করা হয় । স্থানীয়ভাবে বাঁশের মাচা করে, চাটাই ও পাটি বিছিয়ে রোদে শুঁটকি তৈরি করা হয়। এই জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও এনজিও-র সচেতনতামূলক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক জেলে পরিবার সচেতনভাবে শুঁটকি তৈরি শুরু করেছে।

## দুর্যোগ

উপকূলীয় এই জেলাকে সমুদ্রের সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের দিক বিবেচনা করে দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও এই জেলার দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে ভরা জোয়ার, মাটি ও পানির লবণাক্ততা ও জলবায়ুর পরিবর্তন।

**সাইক্লোন :** জেলার অন্যতম প্রধান দুর্যোগ সাইক্লোন। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই জেলায় প্রায় ১৭টি সাইক্লোন আঘাত হানে (৪ থেকে ৯ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন জলোচ্ছ্বাসসহ)। এই সাইক্লোনে প্রতি ঘন্টায় ৫০ থেকে

২৯৫ কি.মি. বেগে বাতাস প্রবাহিত হয়েছে। গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দুটি সাইক্লোন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা আঘাত করে, একটি **১৯৭০** সালের নভেম্বর মাসে, আর একটি **১৯৯১** সালের এপ্রিল মাসে। এই দুটি সাইক্লোনে বরগুনা জেলা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়াও **১৯৯৪** সালের ২৯ এপ্রিল এবং ৩ মে এই জেলায় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে এবং প্রাণহানি ঘটে।

সাইক্লোনে জেলার উপকূলীয় এলাকা এবং মোহনার চরাঞ্চলের ঘরবাড়ি, গাছ-পালা ও প্রচুর গবাদিপশুর প্রাণহানি ঘটে। বিশেষ করে চর এলাকার মৎস্যজীবীরা তাদের সকল উপার্জনের পথ হারায়।

**বরগুনায় উপকূলীয় ঝড়ের প্রভাব**

| সাল | তারিখ | বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ (কি.মি./ঘন্টা) |
|---|---|---|
| ১৯৭০ | ১২ নভেম্বর | ২২৫ |
| ১৯৭৩ | ডিসেম্বর | তথ্য নেই |
| ১৯৭৫ | নভেম্বর | তথ্য নেই |
| ১৯৭৮ | ১-৩ অক্টোবর | ৬৫ |
| ১৯৮১ | ১০ ডিসেম্বর | ১২৫ |
| ১৯৭৩ | ১৪-১৫ অক্টোবর | ৭৫ |
| ১৯৮৩ | ৫-৯ নভেম্বর | ১২৫ |
| ১৯৮৫ | ২৪-২৫ মে | ১৩০ |
| ১৯৮৬ | ৭-৯ নভেম্বর | ৯৫ |
| ১৯৮৮ | ২৪-৩০ নভেম্বর | ১৫০ |
| ১৯৯১ | ২৫-২৯ এপ্রিল | ২৯৫ |
| ১৯৯১ | ৩১ মে-২ জুন | ৭৫ |
| ১৯৯২ | ২০-২১ মে | ৭৫ |
| ১৯৯২ | ১৭-২১ নভেম্বর | ৪৫ |
| ১৯৯৪ | ২৯ এপ্রিল; ৩ মে | ২২৫ |
| ১৯৯৫ | ২১-২৫ নভেম্বর | ৭৫ |
| ১৯৯৬ | ৭-৫ মে | ৪৫ |

**জলোচ্ছ্বাস :** জলোচ্ছ্বাস বরগুনা জেলার আরেকটি প্রধান দুর্যোগ। জলোচ্ছ্বাস একদিকে ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, অন্যদিকে লবনাক্ত পানিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ফসল ও ফসলের মাঠ।

**ভরা জোয়ার :** অমাবস্যা-পূর্ণিমার সময় ভরা জোয়ার দেখা দেয়। বর্ষাকালে স্বভাবতই দেশের উত্তরে নদীর পানি বাড়ে এবং সমুদ্রে নামতে থাকে। এই সময় সমুদ্রের পানির উচ্চতাও বেড়ে যায়। সমুদ্রে কোনরকম ঝড় বাতাস বইলেই নদীর পানি সাগরে নিষ্কাশিত হতে পারে না। ফলে নদীর পানি ৪-৫ ফুট বৃদ্ধি পেয়ে ফসলের ক্ষেতে উঠে এবং বাড়ি ঘর ডুবে যায়। এতে ফসল ও ফলজ এবং বনজ গাছপালার ক্ষতি হয়। বিশেষ করে পানের বরজ এবং আম-কাঁঠাল-কলাগাছ ও শাক-সবজি নষ্ট হয়ে যায়।

**মাটি ও পানির লবণাক্ততা :** সমুদ্রে পানির উচ্চতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই সাথে নদীর প্রবাহ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ফলে শুষ্ক মৌসুমে সাগরের জোয়ারের পানি পূর্বের চেয়ে আরো বেশি উত্তরে আসছে। এতে কৃষি জমির মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদীর মিঠাপানিও লবণাক্ত হচ্ছে। একই সাথে ভূ-গর্ভস্থ পানিতেও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন কৃষি জমি উর্বরতা হারাচ্ছে অন্যদিকে জেলায় খাবার পানি ও বোরো চাষের সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

**নদী ও মোহনায় ভাঙন :** জেলায় নদী ভাঙনের প্রবণতা খুবই বেশি। জেলার ভাঙন প্রবণ নদীর মধ্যে রয়েছে পায়রা, বিষখালী, বলেশ্বর, হরিণঘাটা, আন্ধারমানিক ও কুকুয়া নদী ইত্যাদি। জেলার পূর্ব দিকে বয়ে যাওয়া পায়রা ও আন্ধারমানিক নদীর ভাঙনে আমতলী ও বরগুনা সদর উপজেলার অনেক গ্রাম বিলীন হয়ে গেছে। এ ছাড়াও বিষখালী, বলেশ্বর ও হরিণঘাটা নদীর ভাঙনে পাথরঘাটা, বরগুনা সদর ও বামনা উপজেলার বেশকিছু গ্রামের এখন আর অস্তিত্ব নেই। এই নদী ভাঙনের ফলে যেমনি ভাঙছে গ্রাম, হাটবাজার, ফসল রক্ষাবাঁধ ও ফসলের মাঠ, অন্যদিকে বাঁধ ভাঙার ফলে আসে জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের লোনা পানি। ধ্বংস হচ্ছে ফসলের মাঠ আর গাছ-গাছালি। জেলার দুটি মোহনায় (হরিণঘাটা-বিষখালী এবং পায়রা-আন্ধারমানিক) ভাঙন প্রবণতা বেশি ।

**বন উজাড় :** এই জেলা একসময় সুন্দরবনের অংশ ছিল, যার প্রমাণ এখনো রয়েছে। নদীর পাড়ে, পতিত জমিতে, নদী ও মোহনায় জেগে ওঠা বিভিন্ন ভূমিতে যেসব গাছপালা দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে- নলবন, কেওরাবন, ছৈলাবন, হোগলা পাতা, গোলপাতা ইত্যাদি। এ সব প্রাকৃতিক সম্পদ দিন দিন উজাড় হওয়ার ফলে বিভিন্ন দুর্যোগ বাড়ছে।

যেমন, নদী ভাঙ্গন, নদীর লবণাক্ত পানি খালে বিলে ঢুকে পড়ছে এবং ফসলি জমির উর্বরতা হারাচ্ছে। কমে যাচ্ছে মাছ, পশু, পাখির আশ্রয়স্থল।

## বিপদাপন্নতা

জেলার প্রধান জীবিকা দল যেমন, ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিক। এদের মধ্যে পরিচালিত এক সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৩)-য় দেখা গেছে, সীমিত সম্পদ বা জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অর্থের অভাব ইত্যাদি ক্ষুদ্র কৃষক দলের আর্থ-সামাজিক বিপদাপন্নতা । জেলেদের দৈন্যদশার কারণ হল দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জলদস্যু, জেলেদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, অর্থাভাব, মহাজনী বা দাদন ব্যবসা ইত্যাদি। গ্রামীণ শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে তাদের কাজের অভাব, মজুরি শোষণ, ভগ্ন বা রুগ্ন স্বাস্থ্য, অর্থাভাব, পানি ও পয়ঃ সুবিধার অভাব, আয়ের উৎস কমে যাওয়া ইত্যাদি। বসবাসের জায়গার অভাবসহ কাজের অভাব, জলাবদ্ধতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শহরের দিনমজুর বা শ্রমিকদের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তোলে।

| জীবিকা দল | বিপদাপন্নতা |
|---|---|
| ক্ষুদ্র কৃষক | সীমিত সম্পদ বা জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অর্থের অভাব |
| জেলে | দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, জলদস্যু, জেলেদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, অর্থাভাব, মহাজনী বা দাদন ব্যবসা |
| গ্রামীণ মজুরি শ্রমিক | কাজের অভাব, মজুরি শোষণ, ভগ্ন বা রুগ্ন স্বাস্থ্য, অর্থাভাব, পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব, আয়ের উৎস কমে যাওয়া |
| শহরে মজুরি শ্রমিক | বসবাসের জায়গার অভাবসহ কাজের অভাব, জলাবদ্ধতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা |

# জীবন ও জীবিকা

## জনসংখ্যা

বরগুনা জেলার মোট জনসংখ্যা ৮.৪৫ লাখ, যার মধ্যে পুরুষ ৪.৩৫ লাখ এবং নারী ৪.০৯ লাখ । মোট জনসংখ্যার ৮৯% গ্রামে বসবাস করে। প্রতি বর্গ কি.মিটারে মোট ৪৬২ জন লোক বাস করে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৭৪৩ জন/ বর্গ কি. মি. (বি.বি.এস. ২০০৩)।

| | |
|---|---|
| মোট জনসংখ্যা (লাখ) | ৮.৪ |
| পুরুষ | ৪.৩ |
| নারী | ৪.১ |
| শহুরে জনসংখ্যা (লাখ) | .৯৪ |
| পুরুষ | .৫০ |
| নারী | .৪৪ |
| জনসংখার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.) | ৪৬২ |
| নবজাতক মৃত্যুর হার | ৫৫ |

জেলায় ০-১৪ ও ৬০$^{+}$ বছর বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতার অনুপাত ০.৮০। এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৫ এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯৪ (বিবিএস- ইউনিসেফ ২০০১)

**ঘর-গৃহস্থালি :** জেলায় গৃহস্থালির ধরনে ভিন্নতা আছে। শহুরে (০.২০ লাখ) ও গ্রামীণ (১.৬ লাখ) মিলিয়ে বরগুনার মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ১.৮ লাখ। প্রতিটি গৃহস্থালির জনসংখ্যা গড়ে ৪.৭০ জন (বি.বি.এস. ২০০১) । ১৯৯১ সালের আদম শুমারিতে দেখা যায় যে, বরগুনা জেলার মোট ঘরের ৬৮.৯২% ছন, বাঁশ, পাটকাঠী ও পলিথিন দিয়ে তৈরি ও ৩০.৫৯% ঘর ঢেউটিন বা টালীর তৈরি এবং ০.৪১% সিমেন্টের ছাদ। আবার এসব ঘরের মধ্যে ৬১.১৪% বেড়া পাটকাঠী ও বাঁশের ও ৩.১৬% বেড়া মাটি ও দেশীয় ইটের, ১৭.৬৩% বেড়া টিনের, ১৭.৩২% বেড়া কাঠের এবং ০.৭৪% এর কম ঘরের দেয়াল পাকা।

| ঘরের ছাদ | % |
|---|---|
| ছন, বাঁশ, পাটকাঠী, পলিথিন | ৬৮.৯২ |
| ঢেউটিন/টালী | ৩০.৫৯ |
| সিমেন্টের ছাদ | ০.৪১ |
| ঘরের দেয়াল | |
| পাটকাঠী, বাঁশ | ৬১.১৪ |
| মাটি ও দেশীয় ইট | ৩.১৬ |
| টিন | ১৭.৬৩ |
| কাঠ | ১৭.৩২ |
| পাকা দেয়াল | ০.৭৪ |

**নৃ-গোষ্ঠী :** বরগুনা জেলার উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। আচার-ব্যবহার, দৈহিক গড়ন, বর্ণ, শিল্প ও কলা ইত্যাদির বিচারে প্রতিটি নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্বতা রয়েছে। চাকমা, মারমা, মনিপুরি, রাখাইন বাংলাদেশের প্রধান নৃ-গোষ্ঠী। বরগুনা জেলার আমতলী ও বরগুনা সদর উপজেলায় রাখাইন সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। এই সম্প্রদায় বড়বগী ও বড় বালিয়াতলীতে গ্রামে বসবাস করে। জেলায় রাখাইনদের মোট ২৬৪টি পরিবার রয়েছে। তাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ জন।

## জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলায় সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নেই। জেলায় ১টি সরকারি জেনারেল হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৫টি, পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৮টি, ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ১৮টি, মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র ১টি ও পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ১টি রয়েছে । এ ছাড়া বেসরকারি ২টি ক্লিনিক রয়েছে। জেলার সরকারি হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ২৬১টি। ৩,২৪৩ জন লোকের জন্য একটি শয্যা রয়েছে।

**শিশুস্বাস্থ্য :** জেলায় ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৪% শিশুই অপুষ্টির শিকার। এই পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে যে হাম, ডিপিটি, পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৯২%, ৮৮%, ৯৫% শিশু। এ ছাড়া ৫৩% ORT নিয়েছে (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ ২০০১)। বরগুনা জেলার ৭৯% গৃহে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার রয়েছে।

জেলার জনগণের মধ্যে প্রধানত যে সব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা হলো সর্দি, কাশি, জ্বর, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পেপটিক আলসার, আমাশয় ও টাইফয়েড ইত্যাদি।

**পানি ও পয়ঃসুবিধা :** জেলার ৩৭% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে। এ ছাড়া ৫৬% ঘরে কাঁচা পায়খানা আছে এবং ৭% ঘরে কোনরকম পায়খানা নেই। শহরে এবং গ্রামের পয়ঃসুবিধার পার্থক্য স্পষ্ট। শহরে ৭২% পাকা, ২৭% কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে, ১% কোন পায়খানা ব্যবহারই করে না। গ্রাম এলাকায় ৩১% পাকা, ৬২% কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে, ৭% কোন পায়খানা ব্যবহার করে না।

নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৭২.২% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে, বাকি ২৭% পানি অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভরশীল। বরগুনা জেলার বিভিন্ন উপজেলাতে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা প্রতি লিটারে মাত্র ১ মাইক্রো গ্রাম।

## শিক্ষা

জেলার জনসাধারণের সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক। জেলায় সাক্ষরতার হার (৭$^+$) প্রায় ৫৪% (বি.বি.এস ২০০২), অন্যদিকে প্রাপ্ত বয়স্ক সাক্ষরতার হার (১৫$^+$) ৫৬%, এরমধ্যে পুরুষ ৬০% এবং নারী ৫২% (বি.বি.এস. ২০০৩)।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী জেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে মোট ৯৮১টি। এর মধ্যে সরকারি ৩৭৯টি এবং বাকি সব বেসরকারি ও অন্যান্য স্কুল। মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সরকারি স্কুলে ৫৬,৯০৫ জন এবং বেসরকারি স্কুলে ৫৭,৫৬৬ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৩৭৪৯ জন। জেলায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায় ৪৭টি স্কুল রয়েছে। এর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১২,০৪৬ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৫৮৯ জন। জেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল রয়েছে ১৯৬টি। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮৮,৪০৫ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ৩১৯৯ জন।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মোট ১৯টি কলেজ রয়েছে। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭১২১ জন, শিক্ষক ৩৪৪ জন এবং শিক্ষিকা ৫৪ জন। এ ছাড়া বরগুনা জেলায় ১২৯টি বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে। এ সব মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২১,৭২১ জন। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১০,৪৬৩ জন, ছাত্রীর সংখ্যা ১১,২৫৮ জন।

## সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭$^+$), নিরাপদ পানি সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, শিক্ষার হার রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন দিক বিবেচনায় বরগুনা জেলা সামগ্রিকভাবে উন্নয়নে খুব বেশি এগুতে পারেনি। জেলায় মাথাপিছু আয় (১৬,৯০১) জাতীয় আয়ের (১৮,২৬৯) চেয়ে অনেক কম।

| | |
|---|---|
| **সাক্ষরতার হার (৭+ বছর)** | **৫৪%** |
| **নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত** | **৭২%** |
| **স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা** | **৩৭%** |
| **শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা** | **৩২৪৩ জন** |

## প্রধান জীবিকা দল

জেলার মোট পরিবারের প্রায় ৭৮% কৃষিজীবী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা, বন্যা, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রম অবনতি, ভূমিহীনতা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানুষের জীবিকার ধরনে পরিবর্তন আনছে। চাষের জমি ক্রমবিভাজন একটি পরিবারকে কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল করে রাখতে পারছে না। তাই কৃষক থেকে কৃষি শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে মানুষ এবং শ্রম বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন শহরে বা বন্দরে যাচ্ছে।

জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ কৃষি শ্রমিক, শহুরে শ্রমিক ও মৎস্যজীবী। এ ছাড়াও বিভিন্ন রকমের চাষাবাদ করে মানুষ সংসার চালায় যেমন, শাক-সবজি, কলা ইত্যাদি। এ ছাড়া জেলায় প্রচুর জেলে ও শুঁটকি শ্রমিক রয়েছে।

**কৃষক :** বরগুনা জেলায় মোট ক্ষুদ্র কৃষিজীবী (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫-২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ৮৩,৩৬৫টি (মোট গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের ৫৭%); মধ্যম কৃষিজীবী (২.৫০-৭.৪৯ একর) পরিবার ২৭,৫২৫টি (মোট গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের ১৭%) এবং বড় কৃষক (৭.৫০+ একর) পরিবারের সংখ্যা ৫,৩৯৫টি (মোট গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের ৪%)।

**কৃষি শ্রমিক :** কৃষি জমি ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে, আবার পরিবার বিভাজনের ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণও ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষক রূপান্তরিত হচ্ছে কৃষি শ্রমিকে। জেলার মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ৪৬,৯১৫টি যা মোট পরিবারের ৩২%।

**শহুরে শ্রমিক :** বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত বরগুনা শহরেও শ্রমিক সংখ্যা বেড়েই চলছে। গ্রাম এলাকায় যথাযথ আয়ের উৎসের অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমিহীন মানুষ শহরে ভিড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এরা কেউ কেউ নির্মাণ শ্রমিক, মুটে-মজুর, পরিবহন শ্রমিক, যোগালী হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ্য, জেলায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা কম। একদিকে ধর্মীয় অনুশাসন অন্যদিকে শিক্ষার হার বেশি থাকার ফলে শহরে গিয়ে এরা গার্মেন্টস শিল্পে ও বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ করে।

**জেলে :** জেলায় জেলেদের সংখ্যাও অনেক। এরা সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রমের ক্ষেত্র পরিবর্তন করে থাকে। গ্রীষ্ম আসার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণ শ্রমিক মাছ ধরতে সমুদ্রে যায়। এরা বছরের মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরে। আবার অনেক পরিবার অভ্যন্তরীণ নদী-নালা, খালে সারা বছর মাছ ধরে।

জেলার ৪৪,০০০টি জেলে পরিবার রয়েছে এর মধ্যে ২৭,০০০টি ক্ষুদ্র জেলে পরিবার, ১৪,০০০টি মাঝারি জেলে পরিবার এবং ৩,০০০টি বড় জেলে পরিবার। জেলার গ্রামীণ পরিবারগুলোর মধ্যে ৩৮% পরিবার মাছ ধরার সাথে সংশ্লিষ্ট।

বরগুনা জেলার নদী ও সমুদ্র সৈকত ঘিরে বিরাট মৎস্য শ্রমবাজার গড়ে উঠেছে। ২০ হাজারেরও বেশি মানুষ সাগর, নদী, খালে মাছ ধরা, মাছ বিক্রি, চিংড়ি পোনা আহরণসহ বিভিন্ন কাজে শ্রম দিচ্ছে। এদের মধ্যে যারা চিংড়ির পোনা আহরণ করে এবং অন্যান্য কাজ করে এর বিরাট একটি অংশ শিশু শ্রমিক।

## অর্থনৈতিক অবস্থা

জেলার মোট সক্রিয় জনশক্তি, মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ - এ সবই সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। ১৯৯৯/২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বরগুনাতে সক্রিয় শ্রম জনশক্তির সংখ্যা ৬০৪ হাজার। এর মধ্যে ৬৩% পুরুষ এবং ৩৭% নারী। বিগত ১৯৯৫/৯৬

| | |
|---|---|
| মাথাপিছু আয় | ১৬,৯০১ টাকা |
| মোট শিল্পে আয় | ১২% |
| স্থির দরে বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি | ৫.৬% |
| বিদ্যুৎ সংযোজন সম্পন্ন গৃহ | ২৬% |

সালে জনশক্তি ছিল ১,৩৫১ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ও নারী যথাক্রমে ৬০%, ৪০% (বি.বি.এস., ২০০০)। বর্তমানে জেলায় মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১৬,৯০১ টাকা। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৯ হেক্টর।

## দারিদ্র্য

| | |
|---|---|
| দরিদ্র | ৫২% |
| অতি দরিদ্র | ২২% |
| ভূমিহীন | ৪৯% |
| ক্ষুদ্র কৃষক | ৫৭% |

এই জেলায় অধিকাংশ লোক কৃষি নির্ভর। প্রধান ফসল হচ্ছে ধান। এ ছাড়াও রয়েছে কলা, পান, সবজি ও ইক্ষু ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল ফসলই প্রকৃতি নির্ভর তাই যখনই কোন দুর্যোগ আসে তখন এই সব ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং কৃষকরা পড়ে যায় দুরবস্থায়। আর এই ক্ষতির পরিমাণ ২-৩ বছরে কাটিয়ে উঠতে পারে না। ফলে বহু কৃষক দিন দিন দারিদ্র্য সীমার মধ্যে চলে যায়। এ ছাড়াও নদী ভাঙনের ফলে ধীরে ধীরে বহু পরিবার নীরবে দারিদ্র্য সীমার মধ্যে প্রবেশ করছে। বরগুনা জেলার মোট জনসংখ্যার ৫২% দরিদ্র এবং ২২% অতি দারিদ্র (বি.বি.এস./ইউনিসেফ)। এ ছাড়া জেলার মোট ৪৯% ভূমিহীন এবং ৫৭% ক্ষুদ্র কৃষক (বি.বি.এস.-১৯৯৬)।

# নারীদের অবস্থান

উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বরগুনা জেলার নারীদের অবস্থান মধ্যম মাত্রার ইতিবাচক। স্থানীয় পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক বন্ধন, শিক্ষা নারীদের অবস্থানের পরিবর্তন বয়ে আনছে। নারীদের অবস্থানকে তথাকথিত কঠোর ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ না করে উন্নয়নের অংশীদার করে নেয়ার সময় এসেছে। অতি সম্প্রতি, সিপিডি-ইউ.এন.এফ.পি.এ বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়নসূচক তৈরি করেছে। এতে দেখা যায় বরগুনা জেলা "মধ্যম মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতার" এলাকা। জেলার প্রতিকূল পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন আর দারিদ্র - এ সবই পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- **জেলায় লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৬**
- **৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ৯৪, জাতীয় (৯০) হারের তুলনায় বেশি।**
- **-মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার ১০৯ জাতীয় হারের তুলনায় বেশি।**
- **জেলায় নারীদের কর্মসুযোগ কম।**
- **ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সামাজিক বৈষম্য নারীদের উন্নয়নে সমস্যার সৃষ্টি করে।**
- **শিল্প কারখানা কম থাকায় নারীরা অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে।**
- **স্বাস্থ্যসেবার দিক থেকে নারীরা খুবই পিছিয়ে।**

**লিঙ্গ অনুপাত :** বরগুনার মোট জনসংখ্যার ৪৮.৪৯% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৬, যা সমাজে নারীর নেতিবাচক অবস্থানকে নির্দেশ করে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১১৫। আবার প্রজননক্ষম বয়স দলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ৯৪:১০০ (বি.বি.এস, ২০০১)। জেলার নারীদের প্রজনন হার ১.৯৪(বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ একজন নারী তার জীবদ্দশায় গড়ে ২টি সন্তান জন্ম দেয়। জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৫ জন, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় বেশি। জেলার মাতৃ মৃত্যুর হার নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যুহারকে প্রভাবিত করে।

জেলার ৩৩% নারী বিবাহিত এবং ৩.৩৫% নারী তালাকপ্রাপ্ত বা স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস, ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৮৪% (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)।

**শ্রম বিভাজন :** নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। নারীদের ঘরের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বেশি। ঘরের বাইরে নারীরা প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। তবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্রের কষাঘাতে দরিদ্রতম নারীরা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। জীবন জীবিকার তাগিদে তারা শহরাঞ্চলে কাজ নেয়।

সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রপঞ্চের উপর নির্ভরশীল। তথাকথিত পর্দা প্রথা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন এই জেলার নারীদের গতিশীলতার প্রধান বাধা। তবে, নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের উপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রম উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা, এনজিওদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

**সক্রিয় শ্রমশক্তি :** বরগুনার নারীদের মধ্যে সক্রিয় শ্রমশক্তির হার ক্রমশ কমছে। গত ১৯৯৫-৯৬ সালে সক্রিয় শ্রমশক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের উর্ধ্বে জনগণের ৪০% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে কমে গিয়ে হয়েছে ৩৭%। এই ৩৭% নারী শ্রমশক্তির মধ্যে ২৫% শহরের এবং ৩৮% গ্রামের। গ্রামীণ নারীরা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্রের কারণেই হোক, তারা সেই চিরায়ত ধ্যান-ধারণা ও পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে

বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। আর তাই গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ২.৪৩% নারী পরের জমিতে শ্রম দেয় (বি.বি.এস, ১৯৯৬)।

**স্বাস্থ্য পুষ্টি :** বরগুনার নারীদের অতি অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কাঠামো ও সেবা ব্যবস্থা নারীর স্বাস্থ্য সার্বিকভাবে দুর্বল করেছে। জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ৫%, যা জাতীয় হারের তুলনায় বেশি। পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি ও পয়ঃসুবিধার অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পর্যাপ্ত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯৮% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন। সন্তান জন্ম দেয়ার সময় ৮১% ক্ষেত্রে আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশীরা সহায়তা করেন, ১৫% নারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের সেবা পান আর আধুনিক ডাক্তারদের সেবাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা মাত্র ৪% (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)।

**শিক্ষা :** জেলার ৭ বছর$^+$ বয়সী মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫১%, প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ক্ষেত্রে যা ৫২%। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বরগুনার মেয়েরা এগিয়ে আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ১০৯ এবং মোট ছাত্রছাত্রীদের ৫০% ছাত্রী। একই চিত্র দেখা যায় স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীদের ৫০.৩% এবং মাদ্রাসায় মোট ছাত্রছাত্রীর ৫২% ছাত্রী (ব্যানবেইস, ২০০৩)। তবে কলেজগুলোতে ছাত্রী সংখ্যা কম, ৩৮% ছাত্রী জেলার কলেজগুলোতে লেখাপড়া করে।

# অবকাঠামো

## রাস্তা-ঘাট

বরগুনা জেলায় ১৩২২ কি.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে। এর মধ্যে ২৬ কি.মি. আঞ্চলিক মহা সড়ক, ১৯৮ কি.মি. ফিডার রোড এ, ১৫৪ কি.মি. ফিডার রোড বি, এবং ৪১২ কি.মি. গ্রামীণ -১, ও ৫৩২ কি.মি. গ্রামীণ -২ ধরনের রাস্তা রয়েছে।

| | |
|---|---|
| আঞ্চলিক মহা সড়ক | ২৬ কি.মি. |
| ফিডার রোড–এ | ১৯৮ কি.মি. |
| ফিডার রোড-বি | ১৫৪ কি.মি. |
| গ্রামীণ - ১ | ৪১২ কি.মি. |
| গ্রামীণ - ২ | ৫৩২ কি.মি. |

## নৌ-পথ

এই জেলায় ১৬০ কি.মি. নদী রয়েছে। এ ছাড়াও জেলায় ছোট ছোট নাম না জানা নদী ও খাল মিলিয়ে ১০০ কি.মি. স্থানীয় নৌপথ রয়েছে, যেখানে জোয়ার-ভাটা হয় এবং নৌ চলাচল করে। নৌপথ একদিকে যেমন উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা আবার পরিবহন ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য খুবই জরুরি। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাটেরও উন্নয়ন প্রয়োজন।

## পোল্ডার/বাঁধ

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ভরা জোয়ারের মত বিপর্যয় থেকে রক্ষার তাগিদে বিগত ষাটের দশকে বাংলাদেশে পোল্ডার বা বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। বরগুনা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডেও বেশ কয়েকটি পোল্ডার রয়েছে। এইসব পোল্ডার এলাকায় রয়েছে বাঁধ, নদীর ক্লোজার, রেগুলেটর, ফ্লাশিং ইনলেট, নিষ্কাশন খাল ইত্যাদি। জেলার উপজেলাগুলোকে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ ও সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষার জন্য এসব পোল্ডার নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরও দুটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

| | |
|---|---|
| বাঁধ | ৪১৪ কি.মি. |
| রেগুলেটর | ১৪০টি |
| নিষ্কাশন খাল | ৮৩৫ কি.মি. |
| ইনলেট্স | ২৮৭টি |

এ সব বাঁধ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি করা প্রয়োজন, কিন্তু এর কোন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। এলাকাবাসীর অসচেতনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য-সহযোগিতার অভাব এবং বাঁধ দুর্বল হওয়ার ফলে অনেক সময় ভেঙ্গে যায়। বিশেষ করে বিপর্যয়ের সময় লোনা পানি প্রবেশ করে ফসলহানিসহ অন্যান্য সম্পদ নষ্ট করে।

## ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র

জেলায় মোট ৭০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও ৩টি মাটির কেল্লা রয়েছে (এল.জি.ই.ডি ২০০৪)। এই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে জেলার মোট ১৭% লোক আশ্রয় নিতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় এগুলো জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেয়, খাদ্যগুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং অন্য সময় স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

## হাট-বাজার ও বন্দর

রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন, মানুষের চাহিদা ভোগ্যপণ্য বিস্তারের কারণে জেলায় হাট-বাজার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জেলায় ১১৫টি হাট-বাজার রয়েছে। জেলার বেশির ভাগ

পণ্য এবং পরিবহন হয় নৌপথে। নিম্ন  আয়ের লোকেরা চলাচল করে নৌপথে। অনেক প্রত্যন্ত এলাকা আছে যেখানে নদীপথ ছাড়া উপায়ও থাকে না; তাই বেশিরভাগ লোক নৌপথ ব্যবহার করে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চলাচলের জন্য জেলায় বেশ কয়েকটি নদী বন্দর গড়ে উঠেছে। এই বন্দরগুলোতে অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচল করা স্টীমার, বড় লঞ্চ, ছোট লঞ্চ এবং যন্ত্রচালিত নৌকায় লোক এবং মালামাল উঠানামা করে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, এই বন্দরগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বড় হাট-বাজার ও মোকাম। এ সব বন্দরের সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়লে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। এই জেলায় বাস স্ট্যান্ড রয়েছে এবং প্রতিদিন দূরপাল্লার বাস চলাচল করে।

## বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এ পর্যন্ত ৪৬,৪০০টি পরিবারকে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। এর মধ্যে ১৭,৯৪০টি শহুরে পরিবার এবং ২৮,৪৬০টি গ্রামীণ পরিবার । প্রত্যেকটি উপজেলার সাথেই ঢাকা বা অন্যান্য জায়গার আধুনিক টেলিফোনের যোগাযোগ রয়েছে।

## সেচ ও গুদাম

জেলার কৃষিজীবীরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী দুই ধরনেরই প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এল.এল.পি দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া হয় এবং পাওয়ার টিলার দিয়ে জমিতে চাষ দেয়া হয়। এই জেলায় ৫২টি এল.এল.পি. দিয়ে ১৩৪ হে. জমিতে সেচ দেয়া হয়। জেলায় ৩৪টি খাদ্য গুদাম রয়েছে এই গুদামগুলোর ধারণ ক্ষমতা মোট ১৮,৬৪০ মে. টন। ২টি বীজ গুদাম রয়েছে, যার ধারণ ক্ষমতা ৪০০ মে.টন এবং ৩টি সার গুদাম, যার মোট ধারণ ক্ষমতা ৩৮০০ মে.টন।

| গুদামের ধরণ | সংখ্যা | ধারণক্ষমতা (মে. টন) |
|---|---|---|
| খাদ্য গুদাম | ৩৪টি | ১৮৬৪০ |
| বীজ গুদাম | ২টি | ৪০০ |
| সার গুদাম | ৩টি | ৩৮০০ |

## শিল্পাঞ্চল

ভৌগোলিক কারণে এই জেলায় শিল্প কারখানা গড়ে উঠেনি। মানুষের প্রয়োজনে জেলায় কিছু ধান ভাঙ্গার কল, ডাল-গম ভাঙ্গার কল ও কাঠ চেরাই স-মিল ও মৎস্য সংরক্ষণের জন্য বরফ কল গড়ে উঠেছে।

## উন্নয়ন প্রকল্প

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৪-২০০৫ অনুসারে বরগুনা জেলায় ১৮টি সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এখানে যেসব প্রকল্প ২০০৪ সালের জুন মাসের পরেও চলমান থাকবে সেগুলোর হিসাব তুলে ধরা হয়েছে। যেসব সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে - পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা, জাতীয় সড়ক বিভাগ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও পশুসম্পদ অধিদপ্তর ।

| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | প্রকল্প ংখ্যা |
|---|---|
| বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | ২ |
| পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা | ১ |
| স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর | ৪ |
| মৎস্য অধিদপ্তর | ১ |
| পশুসম্পদ অধিদপ্তর | ১ |
| কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর | ১ |
| জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর | ৩ |
| বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড | ১ |
| সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর | ২ |
| পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড | ১ |
| বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড | ১ |

এ সব প্রকল্পে যে সব উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সহযোগিতা করছে সেগুলো হচ্ছে- আই.ডি.এ (IDA), ডি.এফ.আই.ডি (DFID), ডানিডা (DANIDA), ওপেক (OPEC), আই.ডি.বি (IDB), (UNICEF) ও কুয়েত সরকার।

এই জেলায় বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় NGO মিলে কাজ করেছে। যেমন CODEC, DANIDA ইত্যাদি। স্থানীয় বেশ কিছু এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে।

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জাতীয় NGO এই জেলায় কাজ করছে যেমন BRAC, PROSHIKA, CARITAS, ASA। ২০০১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, জাতীয় এনজিওগুলো বরগুনা জেলার ২৬% পরিবারের মধ্যে ৪৬,৪১০টি ঋণ দিয়েছে। প্রতিটি ঋণ ৭৪৩২ টাকা করে মোট ৩৪৪৯ লাখ টাকা বিলি করা হয়েছে।

## হোটেল/অবকাশযাপন কেন্দ্র

জেলা সদরে একটি সার্কিট হাউজ ও একটি ডাকবাংলো রয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ডাকবাংলো রয়েছে। এ ছাড়া সোনাকাটা ও ফাতরার চরে দু'টি রেস্ট হাউজ রয়েছে।

আমতলীর শতাধিক স্লুইসগেট
প্রভাবশালীদের অবৈধ নিয়ন্ত্রণে

বামনার স্কুলগুলো সমস্যা জর্জরিত

ঝড়ে বরগুনার ৪ গ্রাম লণ্ডভণ্ড
সহায়-সম্বল হারিয়ে কয়েক শ
পরিবার খোলা আকাশের নিচে

ভূমিসন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য
বিপন্ন হতে চলেছে বরগুনার
ঐতিহ্যবাহী প্রাণভারানী খাল

বরগুনায় নিউমোনিয়ায় ১৯৬ জন
আক্রান্ত, পাঁচ শিশুর মৃত্যু

পাথরঘাটা ও শরণখোলার কাছে
সাগরে দুটি ট্রলারে দুর্ধর্ষ ডাকাতি

# সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

বরগুনা জেলার মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং মানুষের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব সমস্যার মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। ২০০৩ সালে এই জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এই বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বন্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩) থেকে জেলার মানুষের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে উঠে, তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

## পরিবেশগত সমস্যা

**সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস :** সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস একে অন্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস হলেই বরগুনা জেলার মানুষের চরম দুর্ভোগ নেমে আসে। বিপন্ন হয়ে পড়ে মানুষের জীবন ও সম্পদ। জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ঘর-বাড়ি, হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল, মহিষ ও ফসল। জেলায় আপদকালীন নিরাপত্তার অভাব ও অপর্যাপ্ত সর্তক সংকেত জেলার মানুষ ও সম্পদের অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করে। সাইক্লোনের পূর্বে জনসাধারণ ও তাদের সম্পদ নিরাপদ স্থানে নেয়ার ব্যবস্থা অপ্রতুল। একই ভাবে চর ও দ্বীপের লোকদের পরিবহনের অভাব ও সচেতনতার অভাব আরো বিপর্যয় ডেকে আনে।

**<u>পরিবেশগত সমস্যা</u>**
- **সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস**
- **ভরা জোয়ার**
- **জলাবদ্ধতা**
- **জলবায়ুর পরিবর্তন**
- **জীববৈচিত্র্য হ্রাস**
- **মাটি ও পানির লবণাক্ততা**
- **পরিবেশ দূষণ**

**<u>আর্থ-সামাজিক সমস্যা</u>**
- **কুটির শিল্প বিষয়ক সমস্যা**
- **কৃষি বিষয়ক সমস্যা**
- **ফলজ কৃষি বিষয়ক সমস্যা**
- **অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা**
- **আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি**

**<u>পর্যটন বিষয়ক সমস্যা</u>**

**ভরা জোয়ার :** এই জেলায় বেশ কিছু চর ও দ্বীপ রয়েছে। এই চর ও দ্বীপগুলো সমতল। ফলে সমুদ্র কোনরকম উত্তাল হলে আর তখন অমাবস্যা/পূর্ণিমা থাকলে এই ভরা জোয়ার দেখা যায় এবং স্বাভাবিক জোয়ারে চর ও ফসলের জমিতে ৩-৪ ফুট পানি হয়। ফলে ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয়।

**জলাবদ্ধতা :** এই জেলায় গ্রাম-গঞ্জের ছোট ছোট খালগুলোর মুখ পলি পড়ে জমির চেয়ে উঁচু হয়ে গেছে। যার ফলে ভরা জোয়ারে পানি উঠলে আর নামতে পারে না। আবার অতি বৃষ্টি হলেও জমিতে পানি জমে ফসলের ক্ষতি করে। উল্লেখ্য গ্রামে অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণ করার ফলেও জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।

**জলবায়ুর পরিবর্তন :** জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে জেলার পেশাজীবী শ্রেণীর জীবন ও জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অনাকাঙ্ক্ষিত এই জলবায়ুর পরিবর্তন একদিকে যেমন ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেদের জীবনে "আয়ের নিরাপত্তাহীনতা"কে তীব্রতর করে তুলছে, অন্যদিকে তেমনি নারী মজুরি-শ্রমিক ও গৃহিণীদের "সম্পদ ও নিরাপত্তা"কে সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

**জীব বৈচিত্র্য হ্রাস :** এই জেলার কিছু মাছ ছিল, যা মিঠা পানি ও লবণ পানিতে পাওয়া যেত যেমন তাপসী, পোয়া, গুলসা ট্যাংরা, ইলিশ ইত্যাদি। এসব মাছ দিন দিন কমে যাচ্ছে। বহু জাতের মাছ আছে যা একেবারেই বিলীন হয়ে গেছে।

**মাটি ও পানির লবণাক্ততা :** নদীর প্রবাহ কমে যাওয়া, নদীর ভাঙন, নদীর তলদেশ ভরাট এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের পানি নদীর অনেক উজানে এবং জমিতেও প্রবেশ করছে। ফলে জমি তার উর্বরতা হারাচ্ছে খুবই দ্রুতহারে। নদীর পানিতে লবণাক্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**পরিবেশ দূষণ :** জেলায় চিংড়ি ঘের ও বর্জ্য, রাসয়নিক সার, শহরের বর্জ্য দিন দিন পরিবেশকে দূষিত করছে। ইদানীং গভীর সমুদ্রে বিদেশী জাহাজ থেকে বর্জ্য পদার্থ ফেলা হচ্ছে ফলে পকূলীয় এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের বর্জ্য সমগ্র উপকূলে ছড়িয়ে যায় এবং পরিবেশ দূষিত হয়।

## আর্থ-সামাজিক সমস্যা

**কুটির শিল্প :** জেলায় বেশ কিছু কুটির শিল্প রয়েছে যেমন, মৃৎ শিল্প, পাপোষ, কাঠের তৈরি তৈজসপত্র, কামার, স্বর্ণকার। এরা বেশিরভাগই দিন দিন অর্থের অভাব এবং সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে পেশা পরিবর্তন করছে। বিশেষ করে সরকারি কোন রকম সাহায্য সহানুভূতি না থাকায় শ্রমিকরা হতাশ হয়ে পড়ছে।

**কৃষি বিষয়ক সমস্যা :** জেলার কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠা সনাতনী পদ্ধতির। এই জেলার কৃষি ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পঙ্গপালের (পামরি) আক্রমণ, উন্নত ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও দুর্যোগ থেকে ফসল রক্ষা করার জ্ঞানের অভাব।

জেলায় সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস হলে বাঁধ বা পোল্ডারগুলো ভেঙ্গে যায় এবং ফসলের মাঠে লবণ পানি প্রবেশ করে সব ফসল নষ্ট করে ফেলে। ঝড়-বাতাসে ফসলের ক্ষেত ধবংস করে দেয়।

আবার রোপা আমন, আউশ, বোরো ধানে প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন রকমের পোকা লাগে। এই পোকা- মাকর ফসল ধ্বংস করে ফেলে। জেলার ফসল রক্ষাকারী বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের অভাব রয়েছে। ফলে একটু ঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং কৃষি ক্ষতিগস্ত হয়। এ ছাড়া বাঁধের মধ্যে মিঠা পানি সংরক্ষণের অভাবে কৃষিকার্য ব্যাহত হয়। বরগুনা জেলায় কৃষকদের প্রতি বছর উন্নতজাতের বীজ সরবরাহেরও অভাব রয়েছে।

**ফলজ কৃষি :** জেলায় বেশ কিছু ফলজ কৃষি চাষ হয় যেমন, কলা, আমড়া, নারিকেল, সুপারি, কুল, তেতুল ও পান। এ সব সম্পদ ঠিকভাবে বাজারজাত না করা বা সংরক্ষণের অভাবে কৃষকরা হতাশ হচ্ছে। এ ছাড়া মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে কৃষকরা প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রকৃত মূল্যের এক বিরাট অংশ এই ফড়িয়া বা আড়তদাররা নিয়ে নেয়। এ ছাড়া পেয়ারা, আমড়া, কলা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ফলন কম হচ্ছে। এখানে কৃষকরা সুপরামর্শ থেকে বঞ্চিত।

**অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা :** অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কয়টি বিশেষ দিক হচ্ছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে এই জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার তেমন উন্নয়ন হয়নি। জেলার বেশিরভাগ লোক বা মালামাল পরিবহনের একমাত্র পথ হচ্ছে নৌপথ। রাজধানীসহ অন্যান্য শহরের সাথে জেলার সড়ক পথে যোগাযোগের একটি মাত্র পথ পটুয়াখালী হয়ে বরিশাল, তারপর অন্যান্য শহর। এতে বেশ কয়েকটি নদী ফেরিতে পার হতে হয়। দ্রুত পৌঁছার জন্য কোন আধুনিক স্টিমার বা লঞ্চ নেই। জেলার অন্যান্য উপজেলাগুলোর সাথেও সড়কপথে তেমন যোগাযোগ নেই। জেলার কৃষকদের বা ব্যবসায়ীদের কোন মালামাল বা উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা খুবই সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

**আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি :** জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়ন দরকার। বিশেষ করে গ্রামে, গঞ্জে, বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা দরকার। জেলার একটা বিরাট অংশ নৌপথে যাতায়াত করে। এই

নৌপথও নিরাপদ করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে সমুদ্র সৈকতে ও সমুদ্রগামী জেলেদের নিরাপত্তার অভাব দূর করা জরুরি।

## পর্যটন বিষয়ক সমস্যা

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা ও আমতলীতে একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু পর্যটকদের সুবিধার জন্য যে বিষয়গুলো প্রয়োজন যেমন, থাকা-খাওয়া, যোগাযোগ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা এর কোনটাই এই জেলায় ঐ সব স্থানে পর্যাপ্ত নেই। জেলার সাথে অন্যান্য জেলার একমাত্র আঞ্চলিক মহাসড়কটি (বরগুনা-বাকেরগঞ্জ-বরিশাল) দীর্ঘদিন থেকে নির্মাণাধীন রয়েছে। পর্যটকদের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে যেতে হলে নৌ পরিবহনে যেতে হয়। কিন্তু এ সব নৌযান খুবই অনুন্নত, এটাও পর্যটন শিল্পের জন্য একটি অন্তরায়।

এই জেলার সমুদ্র উপকূল রাখাইন সম্প্রদায়ের আবাসভূমি। আর এই রাখাইন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পর্যটকদের আকর্ষণ করে। কিন্তু এই রাখাইন সম্প্রদায় বিভিন্ন সামাজিক কারণে দেশের অন্যত্র স্থায়ীভাবে চলে যাচ্ছে। তাই এই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করা একান্ত দরকার।

ইউরোপে সবজির বাজার পেতে পারে বাংলাদেশ

হিমায়িত চিংড়ি রফতানি: সম্ভাবনার নতুন দুয়ার

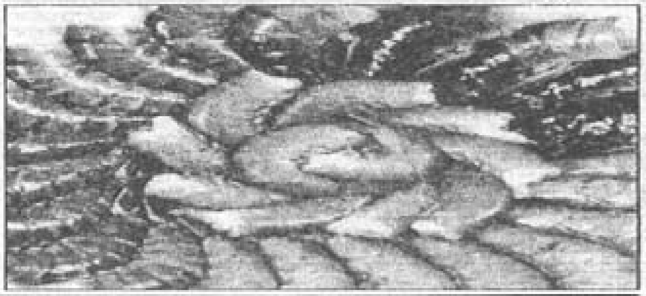

Women in informal job sectors

Preservation of forest resources urged

কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প চার বছরের জন্য আয়করমুক্ত

বরগুনায় ৪২ হাজার হেক্টর জমিতে শীতকালীন আবাদের লক্ষ্যমাত্রা

# সম্ভাবনা ও সুযোগ

কৃষি, মৎস্য সম্পদ, বনজসম্পদ ও পর্যটন শিল্পে বিপুল সম্ভাবনাময় জেলা বরগুনা। জেলা ও মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের জন মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে জেলার প্রধান সম্ভাবনাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কৃষি, মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পর্যটন শিল্প উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও বনায়ন করা গেলে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

## কৃষি ও অর্থনীতি

**ধান :** বরগুনা জেলা সম্পূর্ণভাবে কৃষিনির্ভর। জেলার মূল ফসল ধান। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতিসহ কৃষকদের উন্নতমানের স্থানীয় ধান ও অন্যান্য ফসলের বীজ সরবরাহ ফসল সংরক্ষণের সুব্যবস্থা এবং প্রকৃত মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারলে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

**রবিশস্য :** এই জেলার চর এলাকায় প্রচুর রবিশস্যের চাষ হয়। বিভিন্ন রকমের ডাল, তৈলবীজ, আলু, শাক-সবজি, মরিচ ইত্যাদি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা, সঠিক বাজার মূল্য নিশ্চিত করতে পারলে চাষীরা ব্যাপকভাবে লাভবান হবে।

**কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প :** এখানে কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা প্রচুর। যেমন নারিকেলের ছোবরা থেকে তৈরি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র কাঠ শিল্প, মৃৎশিল্প, কামার ইত্যাদি। এ ছাড়াও এই জেলায় বেশ কয়েকটি মৌসুমী ফল জন্মায়। যেমন পেয়ারা ও আমড়া এই দুটি ফল টিনজাত করে দেশে এবং বিদেশে বাজারজাত করা যায়।

## মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা

এই জেলায় রয়েছে একটি বৃহৎ মৎস্য ভাণ্ডার। একদিকে সমুদ্রের মাছ অন্যদিকে নদী, পুকুর-খাল ও জলাশয়ের মাছ। এ ছাড়া সমুদ্র উপকূলে চিংড়ির পোনা পাওয়া যায়। এই জেলায় বেশ কয়েকটি স্থানে বড় পাইকারি মাছের ঘাট ও আড়ৎ রয়েছে। যেমন, পাথরঘাটা, বরগুনা, তালতলী, আমতলী ও পচা কোরালীয়া। এ সব মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলো অবকাঠামোর দিক থেকে সুযোগ-সুবিধা খুবই কম। যার ফলে জেলেদের মাছ রাখা এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মাছ ব্যবসায়ীদের থাকা-খাওয়ার খুবই সমস্যা হয়। তাই উল্লিখিত স্থানগুলোতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

মৎস্য সম্পদকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে জেলেদের মৎস্য আইন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ রক্ষা করতে পারলে জেলার মৎস্য সম্পদ একটি বড় অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

যথাযথ আইন প্রয়োগ, জেলেদের সুবিধা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি ও জলদস্যুদের প্রতিরোধের মাধ্যমে সমুদ্রের মাছের প্রজাতি রক্ষা ও বাণিজ্যিক আহরণ করা সম্ভব। উন্নত প্রযুক্তি ও মাছ ধরার শক্তিশালী জেলে নৌকা (লঞ্চ) ঋণের মাধ্যমে জেলেদের দিতে হবে। যার ফলে জেলেরা গভীর সাগরের অফুরাণ মাছ ধরবে এবং অগভীর সাগরের উপর চাপ কমবে এবং মাছের পোনা রক্ষা পেলে গভীর সাগরের মাছ উৎপাদন বাড়বে। শুধু তাই নয়, সচেতনতা সৃষ্টিতে জেলেদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

**চিংড়ি চাষ :** বরগুনাতে চিংড়ি চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলার সমুদ্র উপকূলে প্রচুর চিংড়ির পোনা পাওয়া যায়। এই জেলা থেকে চিংড়ির পোনা দেশের বিভিন্ন এলাকায় যায়। এই চিংড়ির পোনা ধরাকে কেন্দ্র করে বরগুনা উপকূলে একটি বড় ধরনের পোনা ধরার শ্রমবাজার এবং কেনা বেচার বাজার গড়ে উঠেছে। ফলে চিংড়ির

পোনা জেলায় সহজলভ্য। এই জেলায় চিংড়ি চাষের উপযুক্ত স্থানগুলোতে পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ করা সম্ভব এবং এতে করে চিংড়ি চাষের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এই জেলায় যদি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও চিংড়িজাত খাবার তৈরি করার ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হয় তাহলে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

**শুঁটকি মাছ :** বরগুনা জেলার অন্যতম সম্ভাবনা শুঁটকি মাছ। সমুদ্রের মাছ শুঁটকি করা হয় জেলার কয়েকটি স্থানে যেমন, সোনাকাটা, ছোটবগী ও তালতলী। এ সব স্থানে সনাতন পদ্ধতিতে সূর্যের আলোতে শুঁকিয়ে শুঁটকি তৈরি করা হয়। যথাযথ আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে এই জেলায় শুঁটকি শিল্পের প্রসার ঘটানো সম্ভব। দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের শুঁটকির চাহিদা আছে। এর থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার সম্ভাবনাও প্রবল। আর তাই নারী-পুরুষ উভয়কেই শুঁটকি তৈরির প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ সাহায্য দেয়া দরকার।

## পর্যটন শিল্প

বরগুনা জেলার পাথরঘাটা ও আমতলী উপজেলাকে কেন্দ্র করে দেশে একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে। পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠার জন্য যে প্রাকৃতিক পরিবেশ দরকার বরগুনা জেলায় সেটি রয়েছে। যেমন, সমুদ্র-সৈকত, মোহনা ও সুন্দরবনের গাছ-গাছালি দিয়ে ঘেরা চর, প্রাকৃতিক পাখ-পাখালির আবাস, সেই সাথে রয়েছে রাখাইন সম্প্রদায়ের বিচিত্র সংস্কৃতি। এই বরগুনাকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ ও সুন্দরবন স্টেটের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর স্থান বলে গণ্য করা হত।

এই জেলাকে পর্যটন জেলা হিসেবে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন করা এবং একই সাথে বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করে পর্যটকদের আকর্ষিত করা গেলে এখানে দেশের একটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে। পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য সোনাকাটার চর ও ছোনবুনিয়া বেশ আকর্ষণীয় স্থান।

পর্যটনের একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। কিন্তু বরগুনা জেলার ভৌগোলিক কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। জেলার একটিমাত্র সহজ যোগাযোগের রাস্তা বরগুনা-বাকেরগঞ্জ-বরিশাল মহাসড়ক দীর্ঘদিন থেকে নির্মাণাধীন। এই আঞ্চলিক মহাসড়কটি সম্পূর্ণ হলে পর্যটন শিল্পের জন্য খুবই সহায়ক হবে। এ ছাড়াও এই জেলায় পর্যাপ্ত থাকা খাওয়ার হোটেল তৈরির জন্য বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একান্ত দরকার।

**উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা :** এই জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব একটা ভাল নয়। ইদানীং জেলা শহরের সাথে ঢাকা বা অন্যান্য শহরের কিছুটা যোগাযোগ সহজ হয়েছে, কিন্তু গ্রাম, হাট-বাজার অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ অপ্রতুল। তাদের একমাত্র যোগাযোগের ব্যবস্থা নৌপথ। তাই জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে অর্থনৈতিক দিক আরও সমৃদ্ধ হবে।

## প্রাকৃতিক সম্পদ

জেলার বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন রকমের গাছ-পালা যেমন, নলবন, হোগলা বন, কেওরা বন এবং বিভিন্ন রকমের গাছ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। এ সব প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা গেলে জেলার ফসল, সম্পদ, নদী-নালা ও ভূমি রক্ষা পাবে।

**বনজ সম্পদ :** জেলায় বিভিন্ন উপজেলার চরে প্রাকৃতিক বন ছাড়াও সরকারি সৃজিত বাগান, অশ্রেণীভুক্ত বন, গ্রামীণ বনজ বাগান মিলিয়ে বনাঞ্চলের পরিমাণ অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং এখনও নদীর তীরে নলবন ও কেওরা বন রয়েছে যা সংরক্ষণ করলে নদীর ভাঙন কমবে।

এই জেলায় বেশ কয়েকটি চর রয়েছে যেখানে সম্পূর্ণভাবে সুন্দরবনের গাছ-গাছালি রয়েছে এবং জন্মাচ্ছে। এ সব বন রক্ষা করা অতি জরুরি। এ ছাড়াও বিষখালী ও বলেশ্বর নদীর মোহনায় সংরক্ষিত বন রয়েছে, যা এই জেলার সুন্দরবনের অংশ।

## শিল্প ও বাণিজ্য

**ব্যক্তিখাত :** জেলার ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করা দরকার। জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তিখাতে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প এবং বেশ কটি বরফকল গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও বহু বছর পূর্ব থেকে চাল ভাঙ্গার কল, স-মিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। এ সব ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ আর্থিক সহযোগিতা করলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

স্থানীয় জনগণ এবং সরকারিভাবে যৌথ ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি থাকলে চাষাবাদে সুবিধা হয়, কারণ পরিকল্পনা মাফিক জমি ব্যবহার করলে জমির সম্পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সেই সাথে জমির উর্বরতাও রক্ষা হয়।

**ব্যবসা-বাণিজ্য :** জেলায় কৃষি, বনজ ও ফলজ বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ঐ সব কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক করা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন, গোডাউন, বিদ্যুতায়ন, জেটি এবং অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করলে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হবে এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। সেই সাথে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে এবং অতি সহজে দেশের বাজারে, স্থানীয় পণ্য পৌঁছানো নিশ্চিত করতে পারলে এই জেলার বাণিজ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে মাছ ব্যবসায়ী ও মাছ বিক্রেতাদের নিরাপত্তা বিধান করা প্রয়োজন।

**শিল্প :** ভৌগোলিক কারণে এই জেলায় শিল্প কারখানা তেমন গড়ে উঠেনি। কিন্তু এই জেলায় শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন, এই জেলায় প্রচুর জনশক্তি ও ধনী ব্যক্তি রয়েছে। সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ ও ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করা ও বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা বিধান করা গেলে এই জেলায় শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে পারে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা যেতে পারে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অবকাঠামো, নীতিগত এবং আইনি সুবিধাদির ব্যবস্থা করে স্ব স্ব উপজেলার প্রবাসীরা বিনিয়োগ করতে পারেন। প্রবাসীরা একদিকে বিনিয়োগ করবেন, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজার নিশ্চিত করবেন সরকারি সহায়তায়।

# ভবিষ্যতের রূপরেখা

| | ২০১৫ | ২০৫০ |
|---|---|---|
| মোট লোকসংখ্যা (লাখ) | ৯.৪৯ | ১২.৩৮ |
| পুরুষ | ৪.৮৭ | ৬.১৯ |
| নারী | ৪.৬১ | ৬.১৯ |
| গ্রামীণ জনসংখ্যা | ৮.০২ | ৮.৮৬ |
| শহুরে জনসংখ্যা | ১.৪৭ | ৩.৫২ |

২০১৫ সালে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর। এ সালে বরগুনা জেলায় জনসংখ্যা ৮.৪৫ লাখ (২০০১) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৯.৪৯ লাখ হতে পারে। মাত্র ১৫ বছরে লোক সংখ্যা বাড়বে ১ লাখ ৪ হাজার । এই বিপুল জনগোষ্ঠীর এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের নানান পথ তৈরি করতে হবে। জেলার উন্নয়নে যে সব সম্ভাবনাকে কাজে লাগান যায় তা হলো কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প, উন্নত কৃষি ব্যবস্থা, চিংড়ি চাষ, উন্নতমানের হাঁস-মুরগির খামার, মাছ চাষ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। সেই সাথে যে সব বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে তা হলো বাণিজ্যে প্রসার, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ও হাট-বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

জেলার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে একটি বিশেষ সুবিধা রয়েছে। পাশের জেলাগুলোর (পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ঝালকাঠী ও বাগেরহাটের অংশবিশেষ) কৃষিজাত দ্রব্যের মূল মোকামগুলো এই জেলায় অবস্থিত। ফলে, উল্লিখিত জেলার ধান, চাল, নারিকেল, সুপারি, কলা ও হাঁস-মুরগির পাইকারি বেচা-কেনা হয় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। জেলার ঐ সব বিখ্যাত হাট-বাজার, মোকামগুলোর আরো কাঠামোগত উন্নতি হওয়া দরকার। বিশেষ করে গোডাউন, রাস্তাঘাট, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অতি জরুরি। তাহলে এই জেলায় হাট- বাজারগুলো আরো বড় আকারে বসবে এবং বিক্রেতা ও ক্রেতাদের আকর্ষণ করবে। এ সব বিষয়ে স্থানীয় বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো যেমন, পাথরঘাটা, আমতলী, ছোটবগী, বড়বগী, আমতলী, বরগুনা ও বেতাগী ইত্যাদি মোকামগুলোতে কাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করলে স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন সম্ভব।

# দর্শনীয় স্থান

বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ অথবা বৃহত্তর বাকেরগঞ্জের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, বরগুনা ছিল এক সময় বাকেরগঞ্জ ও সুন্দরবন স্টেটের স্বাস্থ্যকর স্থান এবং সুন্দরবন স্টেটের মূল প্রাণকেন্দ্র। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মোহনা, সৈকত ও বনাঞ্চল দিয়ে ঘেরা এই জেলা।

**সোনাতলা :** বরগুনা জেলা সদর থেকে ৩২ কিলোমিটার দক্ষিণে সোনাতলা সমুদ্র সংলগ্ন মোহনা। মোহনা ঘেঁষে আছে সবুজ বেষ্টনী এবং সমুদ্র সৈকত। জোয়ারের সময় সবুজ বেষ্টনী ৭-৮ ফুট পানির নিচে তলিয়ে যেয়ে এক অভূতপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্যের সৃষ্টি করে। জেলা পরিষদের উদ্যোগে এই স্থানে পর্যটকদের জন্য একটি রেস্ট হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে।

**লালদিয়া বন বা সমুদ্র সৈকত :** বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার দক্ষিণে লালদিয়ার বন। এই বনের পূর্বে বিষখালী নদী এবং পশ্চিমে বলেশ্বর নদীর মোহনা। এই দুই নদীর মোহনা লালদিয়ার বনকে ঘিরে রেখেছে। আবার বন সংলগ্ন পূর্ব প্রান্তেও সমুদ্র সৈকত। এখানে বিভিন্ন রকমের পাখি বসবাস করে এবং রাতে এই বনে দূর-দূরান্ত থেকে পাখিরা এসে আশ্রয় নেয়। এই বনে কিছু কিছু শীতকালীন অতিথী পাখিও দেখা যায়।

**ফাতরার বন ও সোনাকাটা সৈকত :** আমতলী উপজেলা সদর থেকে ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে বড়বগী ইউনিয়নে টেংরাপিরি মৌজায় টেংরাপিরি বন অবস্থিত। টেংরাপিরি বন স্থানীয় জনগণের কাছে 'ফাতরার বন' নামে পরিচিত। ফাতরার বনে দক্ষিণে কোলঘেষে যে সমুদ্র সৈকত, তাই সোনাকাটা সৈকত। সমুদ্র সৈকত জুড়ে এই বন পূর্ব-পশ্চিমে ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৪ কিলোমিটার প্রস্থ।

**তালতলী** : আমতলী উপজেলার দক্ষিণে তালতলী। তালতলী থেকে ডিসি ঘাট হয়ে বনের মধ্যে দিয়ে রাস্তা নির্মাণের প্রকল্পের কাজ শেষ হলে আলো ছায়ার মাঝে বন/পথ পেরিয়ে সমুদ্র সৈকত দেখে যে কোন ভ্রমণ পিয়াসীর মনকে আকর্ষণ করবে। জেলা পরিষদের উদ্যোগে এখানে একটি রেস্ট হাউজ নির্মাণাধীন রয়েছে।